মুমিনের গুণাবলী

মাওলানা আবুল হোসাইন

মুমিনের গুণাবলী

মাওলানা আবুল হোসাইন

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন ■ মগবাজার ■ বাংলাবাজার

www.amarboi.org

মুমিনের গুণাবলী

মাওলানা আবুল হোসাইন

ISBN : 978-984-8808-41-2

গ্রন্থস্বত্ব
গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশনায়
আহসান পাবলিকেশন
মগবাজার ওয়ারলেছ রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮৩৫৩১২৭

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর-২০১২ ঈসায়ী
মুহররম-১৪৩৪ হিজরী
অগ্রহায়ণ-১৪১৯ বাংলা

প্রচ্ছদ
আহসান কম্পিউটার হাউজ

কম্পিউটার কম্পোজ : আহসান কম্পিউটার
কাটাবন, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৮৬২২১৯৫

মুদ্রণ
র‍্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

মূল্য : আশি টাকা মাত্র

Muminer Gunaboli by Mawlana Abul Hossain Published by Ahsan Publication, Moghbazar, Dhaka-1217. First Edition December 2012

Price **Tk. 80.00** only

www.amarboi.org

পূর্বাভাষ

হৃদয়ের সকল আবেগকে উজাড় করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আলীশানে লক্ষ কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যিনি দুনিয়ার অধিবাসীদের জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত পৃথিবীর একমাত্র গ্রহণযোগ্য আসমানি কিতাব পবিত্র কোরআনুল কারীম তাঁর প্রিয় বন্ধু সায়্যিদিনা মুহাম্মদ (স.) এর মাধ্যমে দান করেছেন। আলহামদু লিল্লাহ।

হৃদয়ের সকল ভালোবাসাকে মিশ্রিত করে অগণিত দরূদ ও সালাম পেশ করছি, মানবতার মহান মুক্তির দূত এবং শিক্ষক, সায়্যিদুল মুরসালিন, খাতামুন নাবিয়্যিন, দোজাহানের বাদশাহ, হতাশায় জর্জরিত পৃথিবীর আলোর একমাত্র পাঞ্জেরী, যাঁর আনীত পথেই আমাদের পথ চলা বিশ্বনবী জনাব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং সর্বোচ্চ জান্নাত কামনা করছি সেই সব আল্লাহর প্রিয় মুমিন বান্দাদের জন্য যাঁদের ঈমানী চেতনা আমাদের জন্য ঈমানী পথে পথ চলার মাইলফলক এবং অনুপ্রেরণার পাথেয়।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি বনি আদম সফলতার অন্বেষণে ঘুরে বেড়ায়। এমন কোন মানুষ নেই যে জীবনে সফলতা চায় না। তবে প্রত্যেক মানুষ একই ধরনের সফলতা চায় না, কেউ চায় অর্থের সফলতা, কেউ চায় জ্ঞানের সফলতা, কেউ চায় স্বাস্থ্যের সফলতা, কেউ চায় আত্ম-মর্যাদার সফলতা আবার কেউ চায় ক্ষমতার সফলতা। কিন্তু মহামহিয়ান এই বিশ্ব চরাচরের প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ঘোষণায় সফল একমাত্র তারাই যারা প্রকৃত মুমিন হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ.

Successful indeed are the Believers

"নিশ্চিতভাবে সফলকাম হয়েছে মুমিনরা।" (সূরা মু'মিনূন : ১)

উক্ত আয়াতের افلح এর মূল শব্দ হলো فلح (ফালাহ) ফালাহ মানে সাফল্য ও সমৃদ্ধি। এটি ক্ষতি, ঘাটতি লোকসান ও ব্যর্থতার বিপরীত অর্থবোধক শব্দ।

www.amarboi.org

যেমন- اَفْلَحَ الرَّجُلُ –মানে হচ্ছে– অমুক ব্যক্তি সফল হয়েছে, নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে, প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী হয়েছে। সুতরাং قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ মানে হচ্ছে– অবশ্যই নিশ্চিতভাবেই মুমিনরা সফলতা লাভ করেছে।

একজন ছাত্র যখন সফলতার শীর্ষে পৌঁছে যায় তখন পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য। যে বৈশিষ্ট্যগুলোই মূলত তাকে সফলতার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। সুতরাং পবিত্র কোরআনুল কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করেছেন, যে বৈশিষ্ট্যগুলোই পারে সর্বোত্তম মুমিনদের কাতারে আমাদের পৌঁছে দিতে। আর এই লক্ষ্যেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো নিজেদের মধ্যে লালন করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার মধ্য দিয়ে জান্নাত লাভ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

পরাক্রমশালী আল্লাহর একান্ত মুখাপেক্ষী
মাওলানা আবুল হোসাইন
০৪.০৯.২০১২ ঈসায়ী

www.amarboi.org

তোহফা

মানব জাতির একমাত্র পথ নির্দেশক
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (সা.) এর জন্য।

'মানুষ যখন নিজকে সঠিকভাবে চিন্তে পারে
তখনই সে পারে মহামহিয়ানের পরিচয় পেতে।
অহীর জ্ঞান আর তাকওয়াই পারে
মানুষকে সফলতার শীর্ষে পৌঁছে দিতে।
সফল মুমিন যে হতে পারে
উপযোগী হয় সে জান্নাত পেতে।'

www.amarboi.org

সূচিপত্র

মুমিনের পরিচয় ॥ ৭
মুমিন অদৃশ্যে বিশ্বাসী হবে ॥ ৮
মুমিন নামাযে বিনয়ী এবং নম্র হবে ॥ ১০
মুমিন অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে ॥ ১১
মুমিন যাকাতের প্রক্রিয়ায় সক্রিয় থাকবে ॥ ১৩
মুমিন তার লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে ॥ ১৫
মুমিন আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে ॥ ১৭
মুমিন নিজের নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হয় ॥ ১৯
মুমিন ভীত হয়ে যায় আল্লাহর স্মরণে ॥ ২২
মুমিনের ঈমান আল্লাহর আয়াতের সম্মুখীনে বেড়ে যায় ॥ ২৪
মুমিন এক আল্লাহর উপরই ভরসা করে ॥ ২৬
মুমিন নামায কায়েম করে ॥ ২৮
মুমিন আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে দান করে ॥ ৩১
মুমিন রবের আয়াতের প্রতি ঈমান আনে ॥ ৩৩
মুমিন রবের সাথে কাউকে শরীক করে না ॥ ৩৫
মুমিন আল্লাহর যমীনে নম্রভাবে চলে ॥ ৪০
মুমিনের আচরণ মূর্খতার জবাবে হয় শান্তিপূর্ণ ॥ ৪৩
মুমিন রাত কাটায় আল্লাহর ইবাদতে ॥ ৪৫
মুমিন সর্বদা আল্লাহর আযাব থেকে পানাহ চায় ॥ ৪৯
মুমিন অপচয় করে না– কৃপণও হয় না ॥ ৫২
মুমিন অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না ॥ ৫৫
মুমিন মিথ্যাবাদী বা মিথ্যা সাক্ষী হবে না ॥ ৫৯
মুমিনরা হবে পরস্পর ভাই ভাই ॥ ৬২
মুমিন হবে ধৈর্যশীল ॥ ৬৬
মুমিন সত্যবাদী হবে ॥ ৭০
মুমিন হবে আল্লাহর অনুগত বান্দা ॥ ৭২
মুমিনের জান-মাল একমাত্র আল্লাহর জন্য বিসর্জন হবে ॥ ৭৫
মুমিন হবে তাওবাকারী ॥ ৭৮
মুমিন হবে ইবাদতকারী ॥ ৮১
মুমিন হবে আল্লাহর প্রশংসাকারী ॥ ৮৫
মুমিন আল্লাহর যমীনে ভ্রমণ করে ॥ ৮৭
মুমিন রুকুকারীদের সাথেই রুকু করে ॥ ৯৫
মুমিন সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে ॥ ৯৮
মুমিন আল্লাহ দেয়া সীমা রক্ষা করে ॥ ১০৪
মুমিন কখনো নিরাশ ও হতাশ হয় না ॥ ১০৬
একনজরে আল কোরআনে মুমিনের বৈশিষ্ট্য ॥ ১১২

www.amarboi.org

মুমিনের পরিচয়

মুমিন আরবী শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ হলো বিশ্বাসকারী বা বিশ্বাসী। আর পারিভাষিক অর্থে মুমিন হল ছয়টি বিষয়ের উপর তথা "আল্লাহর ওপর, ফেরেশতাদের ওপর, আল্লাহর নাযিলকৃত সকল কিতাবের উপর, সকল নবী-রাসূলদের ওপর, পরকালে পুনরুত্থিত হওয়ার উপর এবং লিপিবদ্ধ তাকদীরের উপর" যে ব্যক্তি কোন প্রকার সন্দেহ-প্রশ্ন ছাড়াই বিশ্বাস করে, তাকেই মুমিন বলা হয়। এ প্রসঙ্গে জিবরাঈল (আ.) নবী (স.) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন–

اَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. (بخارى ومسلم)

Believe in Allah, in his angels, books, apostles/prophets, in the day of judgement and also in fortune that determines good or bad.

"আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আখেরাতের দিনের প্রতি এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি তোমরা ঈমান আনো"। এক কথায় বলতে গেলে মুমিন তাকেই বলা হয় যে (প্রাথমিকভাবে) غَيْبٌ (অদৃশ্য) এর প্রতি বিশ্বাসী হয়। হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি বিষয়ের মধ্যে একটি ছাড়া বাকি পাঁচটি কখনই غَيْبٌ (অদৃশ্য) মুক্ত ছিল না। একটি বিষয় কিছু সময়ের জন্য غَيْبٌ (অদৃশ্য) মুক্ত ছিল।

আর তা হলো– নবী-রাসূলগণ অর্থাৎ যখন নবী-রাসূলগণ ছিলেন তখন লোকেরা তাঁদেরকে দৃশ্যমান অবস্থায় দেখতে পেত। কিন্তু এখন ছয়টি বিষয়ের মধ্যে কোনটিই দৃশ্যমান নয় বরং অদৃশ্য অর্থাৎ দেখা যায় না।

আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে বলতে গেলে বলা যায়– নবী-রাসূলগণ যে নিজেদের নবী-রাসূল বলে পরিচয় দিয়েছেন এটি সরাসরি আল্লাহ এসে সাক্ষী দিয়ে যাননি। আমরা মহান আল্লাহকে দেখতে পাই না, তাঁর ফেরেশতাদের দেখা যায় না। তাঁর নাযিলকৃত কিতাব বিশেষ করে কোরআন তাঁর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে তা আমরা দেখিনি এবং সাহাবীগণও সরাসরি কোরআন নাযিল হচ্ছে এমনটি

www.amarboi.org

দেখেননি বরং রাসূলের কাছে নাযিল হয়েছে পরে রাসূল (স.) তাদের নিকট তা উপস্থাপন করতেন। এরপর সাহাবীগণ তা গ্রহণ করতেন পূর্ণ ঈমানের সাথে, পরপারে পা রেখে কেউ পুনরায় জীবন লাভ করেছে আমরা তা দেখিনি এবং ভালো-মন্দ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত তাও আমরা দেখিনি।

যৌক্তিকতাকে অগ্রাধিকার দিলে বলতে হয়, কোন দৃশ্যমান বিষয়কে বিশ্বাস করতে হবে এর কোন ভিত্তি নেই। আর ভিত্তিহীন কোন কথাই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদের বলতে পারেন না। যেমন কেউ আপনার সামনে একটি আপেল এনে বললো বিশ্বাস করুন এটি একটি আপেল। এক্ষেত্রে প্রশ্নের যেমন ভিত্তি নেই, তেমনি বিশ্বাসেরও কোন প্রয়োজন নেই। আবার কেউ হাতের মুঠোয় একটি চাবি লুকিয়ে বললো বিশ্বাস করুন আমার হাতের মুঠোয় একটি চাবি আছে অথচ আপনি জানেন না তার হাতের মুঠোয় কি আছে। এক্ষেত্রেই কেবল আপনার বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বাস করলে আপনি তার প্রতি ঈমান আনলেন অর্থাৎ মুমিন হলেন আর অবিশ্বাস করলে ঈমান আনেননি বা মুমিন হননি।

মুমিন অদৃশ্যে বিশ্বাসী হবে

অদৃশ্যে ঈমান আনয়ন মানে– যা দেখা যায় না, শোনা যায় না, এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা অনুভব করা যায় না, এমন বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা বা বিশ্বাস করা। যেমন– আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, ওহী, ফেরেশতা, আখেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি। এ সত্যগুলোকে না দেখে বিশ্বাস করা এবং প্রদত্ত খবরের ওপর আস্থা রেখে এগুলোকে মেনে নেয়াই হচ্ছে ঈমান বিলগায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাস।

আল কোরআন থেকে কেবল তারাই হেদায়াত লাভ করবে যারা অদৃশ্যমান বিষয়গুলোর ব্যাপারে মুমিন হবে। আর যদি কেউ এমন চিন্তা করে যে, না দেখে, না বুঝে, পরিমাণ বা ওজন না করে, ইন্দ্রিয় দ্বারা স্বাদ-আস্বাদন না নিয়ে তোমার মত কোন জিনিস আমি মেনে নিতে পারি না, তাহলে সে কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে সক্ষম হবে না, অদৃশ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাস একটি পরীক্ষার মাধ্যম। আর এ পরীক্ষার মেয়াদ গায়েবের পর্দা উন্মোচিত হওয়া পর্যন্ত। গায়েবের পর্দা উন্মোচিত হলে সংশোধনের অবকাশ শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন–

وَقَالُوْا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ.

www.amarboi.org

They say : "Why is not an angel sent down to him?" If we did send down an angel, the matter would be settled at once, and no respite would be granted them.

"তারা বলে, এ নবীর কাছে কোন ফেরেশতা পাঠানো হয় না কেন? যদি ফেরেশতা পাঠাতাম, তাহলে এতদিনে কবেই ফয়সালা হয়ে যেত, তখন আর তাদের অবকাশই দেয়া হতো না।" (সূরা আল আনআম : ৮)

অর্থাৎ ঈমান আনার ও নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করার জন্য তোমরা যে সময়-সীমা ও অবকাশ লাভ করেছ এর সময়-সীমা ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ সত্য অদৃশ্যে রয়েছে। নয়তো অদৃশ্যের পর্দা ছিন্ন হবার সাথে সাথেই এ অবকাশের সুযোগ শেষ হয়ে যাবে। একজন মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হবে এক্ষেত্রে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় ও প্রশ্ন ছাড়াই এ অদৃশ্য সত্যগুলোকে সত্য বলে অনায়াসেই মেনে নিবে এবং শুধু নিজেই বিশ্বাস করে ক্ষান্ত হবে না বরং অন্যকেও বিশ্বাস করতে উপদেশ দিবে। শুধু তাই নয় কাউকে অস্বীকার করতে দেখলে সে প্রতিবাদী হয়ে উঠবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা অদৃশ্যে (غَيْبٌ) বিশ্বাসীদেরকেই মুমিন বলে সার্টিফাই করেছেন অর্থাৎ যারা অদৃশ্যে বিশ্বাসী হবে, তারাই কেবল মুমিন বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

ذَالِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ ۛ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ــ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ ــ

This is the Book : in it is guidance sure. Without doubt. to those who fear Allah. Who believe in the Unseen.

"এটি এমন একটি কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। হেদায়াত সেই মুত্তাকিদের জন্য যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে।" (সূরা আল বাকারা : ২-৩)

মুমিন হওয়ার জন্য প্রথম শর্তই হলো তার মধ্যে মুমিন হতে এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন সংশয় থাকতে পারবে না। কেননা, পৃথিবীতে মানুষের পরীক্ষা কেবল মাত্র একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে চলছে। আর সেটি হল সত্যকে না দেখে সে তাকে মানতে প্রস্তুত কিনা? এবং সত্যকে অমান্য করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় তার আনুগত্য করার মতো তার নৈতিক শক্তি আছে কি-না? যেমন মূসা (আ.) বিশাল সাপ দেখে দৌড় দিলেন আর আল্লাহ তায়ালা বললেন মূসা ভয় পেয়েও না সাপটি ধর। মূসা (আ.) একটুও দেরি করলেন না আল্লাহ তায়ালা বলার সাথে সাথে সাপ ধরে ফেললেন। এর নাম হল মুমিন।

www.amarboi.org

মুমিন নামাযে বিনয়ী এবং নম্র হবে

মুমিন খুশুর সাথে সালাত আদায় করবে। খুশু শব্দের অর্থ হচ্ছে কারো সামনে ঝুঁকে পড়া, বশীভূত হওয়া, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা। এ অবস্থার সম্পর্ক দেহ ও মন দুয়ের সাথেই হবে। মনের খুশু হলো– মানুষ কারও শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভাব, প্রতাপ ও পরাক্রমশীলতার দরুন তার সামনে সন্ত্রস্ত ও আড়ষ্ট থাকবে। আর অপরদিকে দেহের খুশু হলো– যখন সে তার সামনে যাবে তখন মাথা নত হয়ে থাকবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনম্র হয়ে যাবে, দৃষ্টি নত থাকবে, কণ্ঠস্বর নিম্নগামী হবে। খুশুর সম্পর্ক মনের সাথে এবং মনের খুশু আপনা-আপনি দেহে সঞ্চারিত হয়। নামাযে খুশু বলতে মন ও শরীরের এ অবস্থাটা বুঝায় এবং এটাই নামাযের আসল প্রাণ। হাদীস শরীফে এসেছে– একদা নবী করীম (স.) এক ব্যক্তিকে নামাযে দাড়ি নাড়াচাড়া করতে দেখে বললেন, "যদি তার মনে খুশু থাকত তাহলে তার দেহেও খুশুর সঞ্চার হতো।"

নামাযের প্রত্যেকটি কাজ ধীরস্থিরভাবে শান্ত সমাহিত চিত্তে করতে হবে। একটি কাজ পুরোপুরি শেষ না হতেই অন্য কাজ আরম্ভ করা যাবে না। নামাযে কোন জিনিস কষ্ট দিতে থাকলে এক হাতে তা সরিয়ে দেয়া যাবে, কারণ ঐ জিনিসটাই নামাযে বিঘ্ন ঘটায়। কিন্তু বারবার হাত নাড়া-চাড়া অথবা দুই হাত এক সাথে ব্যবহার করা যাবে না। ডানে বামে ফিরা যাবে না, মাথা উঠিয়ে উপরের দিকে তাকানো যাবে না, চিন্তা-ভাবনা, হিসাব-নিকাশ করা যাবে না। দৃষ্টিকে সামনের দিকে রাখতে হবে। হানাফি ও শাফিয়িদের মতে, দৃষ্টি সিজদার স্থান অতিক্রম করা যাবে না। মালিকিগণ মনে করেন দৃষ্টি সামনের দিকে থাকা উচিৎ। নামাযের মধ্যে নড়াচড়া করা এবং বিভিন্ন দিকে ঝুঁকে পড়া নিষিদ্ধ। বারবার পরিধেয় বস্ত্র গুটান, ঝাড়া বা তা নিয়ে ব্যস্ত থাকা জায়েয নয়। সিজদায় যাওয়ার সময় সিজদার জায়গা, বসার জায়গা পরিষ্কার করা যাবে না। গর্বিত ভঙ্গিতে খাড়া হওয়া, অধিক জোরে কোরআন পড়া, জোরে জোরে আড়মোড়া ভাঙ্গা এবং তাড়াহুড়া করে টপটপ নামায পড়া, আখেরী বৈঠকে সালাম ফিরানোর ব্যাপারে ইমাম সাহেবকে সতর্ক করা চরম বেয়াদবী, একজন মুমিন যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন সে পৃথিবীর সকল কিছু থেকে তাঁর মন মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা, দেহ-মন সবই এক আল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়ে দিবে। হযরত ইবরাহীম (আ.) যেমন এক আল্লাহর দিকে মুতাওয়াযযাহ হলেন। কোরআনের ভাষায়-

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا.

www.amarboi.org

"For me, I have set my face, firmly and truly, towards Him who created the heavens and the earth.

"আমি একনিষ্ঠভাবে মুখ ফিরালাম সেই মহান সত্তার দিকে যিনি ঐ আকাশ আর যমীনের সৃষ্টিকর্তা।" (সূরা আল আনআম : ৭৯)

অর্থাৎ, মুমিন যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন তাঁর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, তক এবং কালব সবই এক আল্লাহর জন্যই হয়ে যেতে হবে। মুমিন নামায পড়বে আর ভাববে-মনে করবে, আমি আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান, আমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছি। অন্ততপক্ষে এতটুকু ভাবতে হবে বা মনে করতে হবে আল্লাহ আমাকে দেখতে পাচ্ছেন।

মুমিন অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে

অপ্রয়োজনীয় অর্থহীন কথা ও কাজ যাতে কোন ফল পাওয়া যায় না যেগুলোর পরিণাম কল্যাণকর নয় এবং উদ্দেশ্যও ভাল নয়। যেগুলোর আসলে প্রয়োজন নেই, না বললেও চলে। যার কারণেই একজন মুমিন সকল প্রকার অনর্থক এবং বাজে কাজ থেকে দূরে থাকবে এবং এটি তার ঈমানের দাবিও বটে। পবিত্র কোরআনুল কারীমে বর্ণিত রয়েছে–

وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ـــ

And If they pass by futility, they pass by it with honourable.

"এবং তারা (মুমিনরা) অর্থহীন বাজে ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে নিজ মর্যাদা রক্ষা করে তা পরিহার করে চলে যায়।" (সূরা আল ফুরকান : ৭২)

একজন মুমিনের সম্মান-মর্যাদা অপরিসীম, অনর্থক কথা ও কাজ তার মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মূল্যহীন কোন কথা বা কাজ নিজের মধ্যে আনতে পারে না। মুমিনগণ সর্বদা সময়ের মূল্য দেয় এবং দায়িত্ব পালনে সর্বদা সজাগ থাকে। সে এ দুনিয়ার জীবনকে একটি পরীক্ষার ক্ষেত্র মনে করবে। একজন ছাত্র যখন পরীক্ষার হলে পরীক্ষা দিচ্ছে সে তখন মনে করে তার পরীক্ষার হলের প্রতিটি মুহূর্ত তার আগামী জীবনের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণকারী। এ অনুভূতির কারণে সে প্রতিটি মুহূর্ত নিজের প্রশ্ন পত্রের সঠিক উত্তর লেখার চেষ্টায় ব্যয় করে। সে একটি মুহূর্তও বাজে কাজে ব্যয় করে না। ঠিক তেমনি একজন মুমিন ব্যক্তির দুনিয়ার জীবনকালকে এমনভাবে পরিচালনা করে যা পরিণামের দিক দিয়ে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত হয়। মুমিন হয় একজন শান্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ

www.amarboi.org

প্রকৃতির অধিকারী এবং পবিত্র-পরিচ্ছন্ন স্বভাব ও সুস্থ রুচিসম্পন্ন মানুষ। সে সর্বদা ফলদায়ক কথা ও কাজ করে চলে এবং আজে-বাজে, গল্প-গুজব করা তাঁর স্বভাব হতে পারে না। সে ব্যঙ্গ, কৌতুক ও হালকা পরিহাস (সত্যের সাথে মিল রেখে) পর্যন্ত করতে পারে। কিন্তু উচ্ছল ঠাট্টা-তামাসায় মেতে উঠতে পারে না।

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল মুমিনকে জান্নাতে অনেক নেয়ামতের অধিকারী করবেন তার মধ্যে অন্যতম হলো সেখানে তাদেরকে কোন প্রকার বাজে কথা শুনাবেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ــ

Where they shall hear no (word) of vanity.

"সেখানে তারা (মুমিনরা) কোন বাজে কথা শুনবে না।" (সূরা গাশিয়া : ১১)

আল্লাহ তায়ালা যে আচরণকে জান্নাতের নেয়ামত হিসেবে বর্ণনা করেছেন, মুমিন সে নেয়ামতের বিপরীত কোন আচরণ দুনিয়ায় করতে পারে না।

বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.) শিশুতে, শৈশবে, যৌবনে, বৃদ্ধে জীবনের কোন অংশেই অহেতুক কথা ও কাজ করেননি। অথচ আরবের সে সময়ের কালচারই ছিল অহেতুক কথা ও কাজের সমাহার। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "একদা রাতের বেলায় আমি মক্কার এক টিলার চূড়ায় অন্য একজন কুরাইশ বালকের সাথে ছাগল চরাচ্ছিলাম, হঠাৎ ইচ্ছে হলো আরবীয়দের 'সমর' গল্পের আসরে গিয়ে আজ রাতে একটু আনন্দ করি। সঙ্গীকে বললাম, আমার ছাগলটার দেখাশুনা কর আমি একটু 'সমর' শুনে আসি।

কিছু দূর যাবার পর এক বস্তির কাছাকাছি যেতেই বাজনা ও ঢোলে তবলার আওয়াজ কানে ভেসে এল। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম কোন এক লোকের বিয়ে হচ্ছে। তখন কৌতূহলবশতঃ যখন আমি সেই পথে পা বাড়াতে ইচ্ছে করলাম অমনি আমার ভীষণ ঘুম পেল। এমন এক ঘুম যে, একটুও চলতে পারলাম না। ঐখানেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরে সূর্যের কিরণের উত্তাপে অবশেষে ঘুম ভাঙ্গে।" (বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনী)

মুমিন প্রতিটি কাজ আর কথার পূর্বে চিন্তা করে আমার তো প্রতিটি কাজ ও কথা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে এবং হাশরের ময়দানে সবকিছু আমার সামনে উপস্থিত করা হবে আর হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বলে দিয়েছেন–

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ــ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَه.

www.amarboi.org

Then shall anyone who has done an atom's weight of good. See it. And anyone who has done an atom's weight of evil, shall see it.

"অতঃপর যে অতি অল্প পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে এবং অতি অল্প পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সে তাও দেখতে পাবে।" (সূরা আয যিলযাল : ৭-৮)

মুমিন যাকাতের প্রক্রিয়ায় সক্রিয় থাকবে

ইসলামী পরিভাষায় যাকাতের দু'টি অর্থ দাঁড়ায়। এক. এমন ধন-সম্পদ যা পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বের করা হয়। দুই. পরিশুদ্ধ করার মূল কাজটি যদি يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ বলা হয় তাহলে এর অর্থ হবে তারা পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের সম্পদের একটি অংশ দেয়। এভাবে শুধু সম্পদ দেয়ার মধ্যেই ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যদি বলা হয় لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ যা বলা হয়েছে সূরা মুমিনূন-এর ৪ নং আয়াতে, তাহলে এর অর্থ হবে তারা পরিশুদ্ধ করার কাজ করে এবং এ অবস্থায় ব্যাপারটি শুধুমাত্র আর্থিক যাকাত আদায় করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং আত্মার পরিশুদ্ধি, চরিত্রের পরিশুদ্ধি, জীবনের পরিশুদ্ধি, অর্থের পরিশুদ্ধি ইত্যাদি প্রত্যেকটি দিকের পরিশুদ্ধ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। নিজের জীবনের পরিশুদ্ধি ছাড়াও চারপাশের জীবনের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত হয় অর্থাৎ মুমিনরা নিজেদেরকে যেমন পরিশুদ্ধ করে, তেমন অন্যদেরকেও পরিশুদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করে। তারা নিজেদের মধ্যে যেমন মৌল মানবিক উপাদানের বিকাশ সাধন করে তেমনি বাইরের জীবনেও তার উন্নতির প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ـــ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ـــ

Truly he succeeds that purifies it. And he fails that corrupts it.

"সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি যে পবিত্রতা অর্জন করেছে এবং নিজের রবের নাম স্মরণ করে নামায পড়েছে।" (সূরা আল আ'লা : ৯-১০)

যাকাত সকল নবীদের দ্বীনে বা জীবন ব্যবস্থায় ফরয ছিল এবং সকল নবীই এর প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। অন্যান্য সব নবীদের মতো বনী ইসরাঈলদের নবীগণও এর প্রতি কঠোর তাগিদ দিয়েছিলেন। কিন্তু ইহুদীরা এ ব্যাপারে গাফেল

www.amarboi.org

হয়ে পড়েছিল। তাদের সমাজে যাকাত ব্যবস্থা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং যাকাতের পরিবর্তে তারা সুদ খেতো।

হযরত মূসা (আ.) এর জাতির লোকদের হৃদয় ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। ধন-সম্পদের জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করত না। এজন্য আল্লাহ তায়ালা এ মহান সম্মানিত পয়গাম্বরের প্রার্থনার জবাবে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন যে, তোমার উম্মত যথারীতি যাকাত আদায় করলে আমার রহমত পেতে পারবে। অন্যথায় জেনে রেখ তারা আমার রহমত হতে বঞ্চিত হবে এবং আমার আযাব তাদেরকে বেষ্টন করবে। হযরত মূসা (আ.) এরপরেও বনী ইসরাঈলদেরকে বার বার এ সতর্ক করা হয়েছে। সর্বশেষ তাদেরকে সুস্পষ্ট নোটিশ জারি করে দেয়া হলো–

وَقَالَ اللّٰهُ إِنِّيْ مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ.

And Allah said : I am with you if ye (but) establish regular prayers, pay Zakat believe in my Messengers, honor and assist them, and loan to Allah a beautiful loan, verily I will wipe out from you your evils.

আল্লাহ বললেন, হে বনী ইসরাঈল : তোমরা যদি নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় করতে থাক, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আন, তাদের সাহায্য কর এবং আল্লাহকে করযে হাসানা দাও। তাহলে আমি তোমাদের সাথী এবং তোমাদের দোষ ত্রুটিগুলো দূর করে দেব অন্যথায় রহমত লাভের কোন আশাই তোমরা করতে পার না।" (সূরা আল মায়েদা : ১২)

একমাত্র দয়াময়, রাজাধিরাজ আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের যথার্থতা এখানেই। আমাদের কাছে যা কিছু আছে, তা সবই তাঁরই দান-অন্য কোথাও থেকে বা অন্য কারো কাছ থেকে আমরা তা পাই না। তাঁরই ভাণ্ডার থেকে আমরা পেয়ে থাকি, কিন্তু যা কিছু আমরা দেই, তাঁকে নয় বরং আমাদেরই আত্মীয়, ভাই, বন্ধু ও নিজ জাতির লোকদেরকেই দিয়ে থাকি কিংবা নিজেদের সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করি, যার ফল শেষ পর্যন্ত আমরাই পেয়ে থাকি। কিন্তু সেই মহান দাতার বদান্যতার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় তিনি এসকল দান সম্পর্কে বলেন যে, এটা তাঁকে ঋণ দেয়া হয়েছে, এর ফল আমিই তোমাদের দেব, বস্তুত বদান্যতার এ অতুলনীয় পরাকাষ্ঠা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার পক্ষেই শোভা পায়, কোন মানুষ এর ধারণাও করতে পারে না।

www.amarboi.org

একজন মুমিন কখনো এ সুযোগ হাত ছাড়া করতে পারে না। সে আল্লাহর সাথে এ ব্যবসায় লিপ্ত হয়ে নিজ সম্পদকে যেমন পবিত্র রাখবে তেমনি আবার নিজেকেও পবিত্র করবে এবং সে নিজেকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.

And spend of your substance in the cause of Allah, and make not your own hands contribute to (your) destruction.

"আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর এবং নিজের হাতেই নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না (আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করলেই নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা হয়)।" (সূরা আল বাকারা : ১৯৫)

মুমিন তার লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে

বিশ্বনবী (স.) বলেছেন- "কোন পুরুষ কোন পুরুষের লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দিবে না এবং কোন নারী কোন নারীর লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দিবে না।" (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমদ)

লজ্জাস্থানের হেফাযত কেবলমাত্র প্রবৃত্তির বাসনা থেকে দূরে থাকা নয়, নিজের লজ্জাস্থানকে অন্যের সামনে উন্মুক্ত করা থেকে দূরে থাকাও বুঝায়। হযরত জারহাদে আসলামী বর্ণনা করেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স.) এর মজলিসে আমার রান খোলা অবস্থায় ছিল। নবী (স.) বললেন "তুমি কি জানো না রান ঢেকে রাখার জিনিস?" কেবল অন্যের সামনে নয় একান্তেও উলঙ্গ থাকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূল (স.) ইরশাদ করেন–

إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّي فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لاَيُفَارِقُكُمْ إِلاَّ عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِيْنَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوْهُمْ وَأَكْرِمُوْهُمْ.

"সাবধান কখনো উলঙ্গ থেকো না। কারণ তোমাদের সাথে এমন সত্তা আছে যারা কখনো তোমাদের থেকে আলাদা হয় না (কল্যাণ ও রহমতের ফেরেশতা), তোমরা যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দাও অথবা স্ত্রীদের কাছে যাও সে সময় ছাড়া। কাজেই তাদের থেকে লজ্জা করো, তাদের সম্মান করো।" (তিরমিযী)

শরীয়তে পুরুষের ন্যায় নারীদের ব্যাপারে দৃষ্টি সংযমের ব্যাপারে বিধান বিদ্যমান রয়েছে। তারা পুরুষের মতোই ভিন্ন পুরুষদের দেখতে পারবে না। একদা হযরত

www.amarboi.org

উম্মে সালামাহ ও হযরত উম্মে মাইমুনাহ নবী (স.) এর কাছে বসা ছিলেন। এমন সময় হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম এসে গেলেন। তখন নবী (স.) উভয় স্ত্রীকে বললেন : তাঁর থেকে পর্দা করো। স্ত্রীদ্বয় বললেন : 'হে আল্লাহর রাসূল (স.) তিনি কি অন্ধ নন? তিনি তো আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না; রাসূল (স.) তখন বললেন : 'তোমরা দু'জনও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছো না?' (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

সুতরাং মুমিন নারী হোক অথবা পুরুষ হোক সে কোরআন ও হাদীসের ভাষ্যমতে পর্দা অবলম্বন করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ প্রসঙ্গে বলেন–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۚ ذَالِكَ أَزْكٰى لَهُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ.

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ.

Say to the believing men that they should lower their graze and guard their modesty : that will make for greater purity for them : and Allah is well acquaimted with all that they do. And say to the believing women that they should lower their gaze and guard thair modesty; that they should not display their beauty and ornaments except what (ordinarily) appear there of, that they should draw their veils over their bosoms.

"(হে নবী) মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে। এটি তাদের জন্য বেশি পবিত্র পদ্ধতি। যা কিছু তারা করে আল্লাহ তা জানেন। (হে নবী) মুমিন মহিলাদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে আর তাদের সাজ-সজ্জা না দেখায়, যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় তা ছাড়া। আর তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল দিয়ে তাদের বুক ঢেকে রাখে।" (সূরা আন নূর : ৩০-৩১)

এ ব্যাপারে রাসূল (স.) এর একাধিক হাদীস রয়েছে। যেমন–

www.amarboi.org

وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (رَضـــى) قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرِ الفُجَاءَةَ فَامَرَنِىْ اَنْ اَصْرِفُ بَصَرَكَ ــ

হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে এই মর্মে প্রশ্ন করেছিলাম যে, হঠাৎ যদি কোন মহিলার ওপর দৃষ্টি নিপতিত হয়, তাহলে কি করতে হবে? রাসূল (স.) আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, 'তুমি তোমার দৃষ্টিকে কালবিলম্ব না করে ফিরিয়ে নিবে।" (মুসলিম)

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـــ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَـــوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.

ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স.) বলেছেন : "মহিলারা হল পর্দায় থাকার বস্তু, সুতরাং তারা যখন (পর্দা উপক্ষো করে) বাইরে আসে, তখন শয়তান তাদেরকে (অন্য পুরুষের চোখে) সু-সজ্জিত করে দেখায়।" (তিরমিযী)

মহিলারা হলো, পেঁয়াজের ন্যায়। পেঁয়াজের খোসা ফেলে দিলে যেমন পেঁয়াজ নষ্ট হয়ে যায় দুই/তিন দিনের মধ্যে এবং তা থেকে দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। অনুরূপভাবে মহিলারা যদি বেপর্দা হয়ে যায় তখন পেয়াজের ন্যায় আত্ম-মর্যাদা হারিয়ে সমাজের নিন্দনীয় শ্রেণীতে পরিণত হয়। যার ফলে সমাজ দূষিত হয়ে যায়, নেমে আসে অসুস্থ পরিবেশ।

মুমিন আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে

আমানত শব্দটি আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত, সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত ও ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সকল আমানত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর ওয়াদা, চুক্তি অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে, মানুষ ও মানুষের মধ্যে এবং জাতি ও জাতির মধ্যে অনুষ্ঠিত সকল চুক্তিকে বুঝায়। এক্ষত্রে গরিব-ধনী, ছোট-বড়, সাদা-কালো, মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে সকলের চুক্তি রক্ষা করার গুরুত্ব একই রূপ। সে দরিদ্র বলে তার সাথে চুক্তি ভঙ্গ করলে সে কিছুই করতে পারবে না। তাই তার সাথে চুক্তি বা ওয়াদা রক্ষা না করলেও চলবে, এরূপ ধারণা করার বিন্দু পরিমাণও সুযোগ নেই।

একজন মুসাফির আপনার কাছে কিছু টাকা আমানত রাখল। আপনার চিন্তা করার সুযোগ নেই যে, সেতো মুসাফির সে আমার কিছুই করতে পারবে না। সুতরাং

www.amarboi.org

তার আমানত রক্ষা না করলেও চলবে। এরূপ আচরণ যদি আপনি করে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে আপনি মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি। আপনি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করেন না। আপনার মধ্যে ঈমান ও দ্বীনদারী বলতে কিছুই নেই। কারণ হলো, যার মধ্যে ওয়াদা ও আমানত ঠিক থাকে না সে আর মুমিনদের কাতারে থাকে না। তার পরিচয় ভিন্ন হয়ে যায়। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ.

"যার মধ্যে আমানতদারিতা নেই তার ঈমান নেই, আর যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার বৈশিষ্ট্য নেই তার মধ্যে দ্বীনদারী নেই।" (বায়হাকী)

এই জন্যে বলা হয়, কাউকে যদি চিনতে এবং জানতে হয় তাহলে তার সাথে লেনদেন বা ওয়াদায় আবদ্ধ হও। ওয়াদা রক্ষা করতে পারলে বুঝতে হবে তার মধ্যে দ্বীনদারিত্ব আছে এবং মুমিন কিনা জানতে চাইলে তার কাছে আমানত রাখ, আমানতের সঠিক জবাব দিতে পারলে বুঝতে হবে তার মধ্যে ঈমান রয়েছে তথা সে মুমিন। কিন্তু বিপরীত আচরণ পেলে তাকেও বিপরীতভাবেই বুঝে নিতে হবে। তাকে চিনতে হবে হাদীসের ভাষ্য মতে একজন মুনাফিক বলে, রাসূল (স.) ইরশাদ করেন–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرْبَعَ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةَ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةَ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) বলেন : চারটি (দোষ) যার মধ্যে থাকে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে উক্ত দোষগুলোর কোনো একটি থাকে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকির একটি স্বভাব থেকে যায়। ১. তার কাছে কোনো আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে ২. সে কথা বললে মিথ্যা বলে, ৩. ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, ৪. আর সে ঝগড়া করলে গালাগালি করে। (বুখারী, মুসলিম)

www.amarboi.org

মুমিন নিজের নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হয়

পবিত্র কোরআনুল কারীমে নিজেদের নামাযে 'বিনয় নম্র' আলোচনায় নামায শব্দটিকে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। আর নিজেদের নামাযে যত্নবান আলোচনায় নামায শব্দটিকে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। উভয়ের মধে পার্থক্য হলো নিজেদের নামাযে 'বিনয়-নম্র' আলোচনা দ্বারা মূল নামাযকে বুঝানো হয়েছে। আর নিজেদের নামাযে যত্নবান আলোচনা দ্বারা পৃথকভাবে প্রতিটি ওয়াক্তের কথা বুঝানো হয়েছে।

নামাযসমূহের সংরক্ষণ বা যত্নবান এর মানে হলো- মুমিন নামাযের ওয়াক্ত, নামাযের নিয়ম-কানুন মোটকথা নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি জিনিসের প্রতি পুরোপুরি খেয়াল রাখে। অযু ঠিক মতো করে, কখনো যেন বিনা অযুতে নামায না পড়া হয় এদিকে খেয়াল রাখে, সঠিক ওয়াক্তে নামায পড়ে। নামাযের সমস্ত আরকান পুরোপুরি ঠাণ্ডা মাথায় পূর্ণ একাগ্রতা ও মানসিক প্রশান্তিসহকারে আদায় করে। একটি বোঝার মতো তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিয়ে সরে পড়ে না। যা কিছু নামাযের মধ্যে এমনভাবে পড়ে যাতে মনে হয় বান্দাহ তার প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে নিবেদন করছে। মনে হচ্ছে একান্ত সাক্ষাতে মনের কথাগুলো সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করছে। আর প্রিয় ব্যক্তিটি তার মনের প্রতিটি কথার উত্তর দিচ্ছে।

একজন মুমিনকে এমন নামাযী হতে হবে, যে নামাযের মধ্য দিয়ে জীবনের সর্বক্ষণ নিজেকে আল্লাহর গোলাম বলে মনে হবে, অনুগত গোলামের ন্যায় মালিকের অধীন মনে হবে এবং মালিকের হুকুম পালনের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকার মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। মহান আল্লাহর দাস হওয়ার অনুভূতি, আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর কিতাবের প্রতি ঈমান, পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহভীতি, আল্লাহকে আলেমুল গায়েব বলে স্বীকার করা, তাঁকে সবসময়ই নিজের কাছে অনুভব করা, তাঁর হুকুম পালনের জন্য সর্বদা নিজেকে প্রস্তুত রাখা। আল্লাহর হুকুমগুলো ভাল করে জানার এবং পালন করার মন-মানসিকতা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করা, আমানতদারী হওয়া, সময়ানুবর্তী হওয়া এসব গুণ মুমিনের মধ্যে সৃষ্টি হবে তখনই যখন সে নামাযের ব্যাপারে পূর্ণ যত্নবান হবে।

নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হতে হলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো আযান শোনা মাত্রই পার্থিব জীবনের সকল ব্যস্ততা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মসজিদের দিকে চলে আসতে হবে। যে কাজটি একটি সৈন্যবাহিনীর কথা স্মরণ

www.amarboi.org

করিয়ে দেয়। সৈন্য শিবিরে 'বিউগলের' আওয়ায হওয়ার সাথে সাথেই প্রত্যেকটি সৈনিক বুঝতে পারে যে, সেনাপতি সকলকে ডাকছেন। এ সময় সকলের মনে একই ভাব উদয় হয়। সেই ভাবটি হচ্ছে সেনাপতির নির্দেশ পালনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তখন যে যেখানেই থাকে সে সেখান থেকে নির্দিষ্ট স্থানে ছুটে আসে।

প্রিয় পাঠক, সৈন্যদের জন্য এ নিয়ম কেন করা হয়েছে? যাই হোক উত্তরটা আমিই দেই– দু'টি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ নিয়মটা করা হয়েছে। যেমন–

এক. যেন প্রত্যেকটি সৈনিকের মধ্যে হুকুম পালনের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকার অভ্যাস বিদ্যমান থাকে।

দুই. সকল অনুগত সিপাহীদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী দল গঠন করা যারা সেনাপতির আদেশে একই সময়ে একই স্থানে সমবেত হওয়ার অভ্যস্ত থাকবে, আর এ অভ্যাসদ্বয় এজন্য যে, যে কোন মুহূর্তে কোন শত্রু পক্ষের হামলা আসলে যেন সকল সিপাহী একই আওয়াযে একই স্থানে একত্রিত হয়ে মোকাবিলা করতে পারে।

অনুরূপভাবে মুমিনদের জন্য আযান হলো একটি বিউগল; যার মাধ্যমে মুমিনদের নিকটস্থ মসজিদে দৈনিক পাঁচবার হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ করা হয় এবং সকল মুমিন যেন আল্লাহর একটি সৈন্য দলে পরিণত হতে পারে। দৈনিক পাঁচবার আযান নামক বিউগলের মাধ্যমে একত্রিত হওয়ার অভ্যাস করানো হয় যেন দুনিয়ার যেই কোন তাগুত শক্তির হামলার মোকাবিলায় এক দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়।

আর স্বাভাবিকভাবেই দুনিয়ার সকল সৈনিক বাহিনীর চাইতে আল্লাহর সৈনিক বাহিনীকে শক্তিশালী হতে হবে। কারণ হল অন্যান্য সৈনিক দলের পক্ষে বহুকাল পরে কখনো কখনো হয়ত যুদ্ধ করতে হয়। নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করতে হয় বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৈনিকদের প্রতিটি মুহূর্তেই শয়তানি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয় এবং প্রত্যেক মুহূর্তে সেনাপতির আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। এই জন্যই মুমিনদেরকে দৈনিক পাঁচবার খোদায়ী 'বিউগল' নামক আযানের আওয়াযে মসজিদের দিকে ছুটে আল্লাহর সামনে মস্তক অবনত করতে হয়, আর একেই বলা হয় নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া, ব্যক্তি যত পথ হারাই হোক না কেন, যত বিপথগামীই হোক না কেন সে যখনই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হবে তখনই সে সঠিক পথ লাভ করতে সক্ষম হবে। এ প্রেক্ষাপটে আমি সর্বদা একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি। সেটি হলো–

www.amarboi.org

বাগদাদ শহরের একটি মসজিদের পেশ ইমাম, তাঁর স্ত্রী ছিল অত্যন্ত সুন্দরী, রূপসী এবং সুনয়নী। স্থানীয় এক দুর্দান্ত মাস্তান যুবক হঠাৎ একদিন ইমাম সাহেবের স্ত্রীকে দেখে তার প্রতি ভীষণ আসক্ত হয়ে পড়ে এবং এরপর রীতিমতো তাকে বিরক্ত করতে থাকে। একদিন ইমাম সাহেবের বাড়ীতে প্রবেশ করে বলল, হে সুন্দরী মহিলা, আমি ইতিমধ্যে তোমার প্রতি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছি। তাই আমার বাসনা চরিতার্থ করার জন্য প্রস্তাব দিচ্ছি। তুমি কি আমার প্রস্তাবে রাজি?

মাস্তান যুবকের প্রস্তাব মহিলা নীরবে শুনলেন এবং ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। রাতে যখন স্বামী ঘরে ফিরলেন, যুবকের প্রস্তাবিত কথাগুলো তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন, ইমাম সাহেব বললেন, তুমি রাজি হয়ে যাও। তবে একটি শর্তে, যদি সে একটানা চল্লিশ দিন আমার মসজিদে জামাআতের সাথে নামায আদায় করে এবং এ শর্ত আগে পূরণ করে, তাহলে তুমি বলবে আমি রাজি।

পরের দিন যুবক এসে জিজ্ঞেস করলো, আমার প্রস্তাবের সম্মতি পাব কি?

মহিলা বললেন, একটি শর্তের ভিত্তিতে আমি তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি, শর্তটি হচ্ছে কোন বিরতি না দিয়ে একটানা চল্লিশ দিন আমার স্বামীর মসজিদে জামায়াত সহকারে নামায আদায় করতে হবে। তারপর আমার কাছে আসবে।

যুবক বললো, এটা তো অতি সহজ শর্ত। এর চেয়েও কঠিন শর্ত দিলে আমি মেনে নিতাম।

এবার যুবক পাক পবিত্র সুন্দর পোশাক পরিধান করে নামায পড়তে লাগলো। ফজরের পর যোহরের অপেক্ষা করে। যোহরের পর আছর। এরপর মাগরিব। এরপর এশা কোন বিরতি নেই নামাযে। এভাবে চল্লিশ দিন পার হয়ে গেল।

অতঃপর এ যুবক ইমাম সাহেবকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠলো এবং বললো, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি অন্ধকার পথে বিভ্রান্ত হয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। আল্লাহ পাক আমাকে আলোর পথ দান করেছেন। সুপথ দান করেছেন। আমাকে দয়া করে মাফ করে দিন।

এবার ইমাম সাহেব যুবককে নিয়ে মুনাজাত ধরলেন,

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

Our lord, let not our hearts deviate now after thou hast guided us, and grant us mercy from you. Truly you are the granter of Bounties without measure.

www.amarboi.org

"হে আল্লাহ তায়ালা! সুপথ প্রদর্শন করার পর আমাদের অন্তরকে আর বক্র করে দিও না। আর আপনার নিকট থেকে আমাদেরকে করুণা দান করুন। কারণ আপনি অসীম করুণার আঁধার।" (সূরা আল ইমরান : ৮)

সুতরাং সু-পথে আমৃত্যু পর্যন্ত টিকে থাকতে হলে অবশ্যই নামাযের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান হতে হবে। যখনই চরিত্রে নামাযের ব্যাপারে অবহেলা অবলোকন হবে তখনই বুঝতে হবে সুপথে ব্যক্তি অধিষ্ঠিত নেই। তার ঈমানে ধস নেমেছে, এই জন্য সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিজের চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে। যে কাজ করে থাকবে একজন পূর্ণ মুমিন ব্যক্তি। নামাযের সময় হলে মুমিন ব্যক্তি একমাত্র নামায ছাড়া কোন কিছুর মাঝে শান্তি পায়না, পায়না আত্মতৃপ্তি।

মুমিন ভীত হয়ে যায় আল্লাহর স্মরণে

খোদাভীতি এমন একটি গুণের নাম, মুমিন হওয়ার জন্য এর কোন বিকল্প নেই। দুনিয়ার কল্যাণ, পরকালীন মুক্তি এবং সাফল্য এর মধ্যেই নিহিত। ব্যক্তি জীবনের সুখ, পারিবারিক জীবনের শান্তি, সামাজিক জীবনের শৃঙ্খলা, রাষ্ট্রীয় জীবনের স্থিতিশীলতা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ভারসাম্য সব কিছু যেন খোদা ভীতির বেষ্টনীর আওতায় বিদ্যমান। নবী করীম (স.) বলেছেন, 'তাকওয়াকে' গ্রহণ কর, তা সমস্ত কল্যাণের উৎস।"

ইসলামে সাদা-কালো, আরবি-আজমি, ধনী-গরিব এর মাধ্যমে মানুষের মর্যাদা মূল্যায়ন হয় না বরং তাকওয়ার মাধ্যমেই মানুষ মর্যাদাবান হয়। এ ক্ষেত্রে কোরআনুল কারীমের বক্তব্য হলো–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

O mankind! we created you from a single (pair) of a male and a female, and made you into nations and tribes. That ye may know each other (not that ye may despise each other). Verily the most honoured of you in the sight of Allah is (he who is) the most righteous of you. And Allah has full knowledge and is well acquainted (with all things)

"হে মানবমণ্ডলী : আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও নারী (আদম ও হাওয়া)

www.amarboi.org

থেকে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই মর্যাদাবান যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু! নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক জ্ঞাত এবং সর্বজ্ঞ।" (সূরা আল হুজুরাত : ১৩)

মুমিনকে প্রতিটি মুহূর্তে স্মরণ রাখতে হবে যে, তার কোন কথা, কোন কাজ, কোন আচরণ এবং কোন পদক্ষেপ যেন আল্লাহ তায়ালার পছন্দের বিপরীত না হয়। প্রতিটি কাজে মুমিন মহান আল্লাহকে ভয় করে চলবে এবং এটাই হলো, ঈমানের দাবি। মুসলিম জাহানের খলিফা হযরত ওমর (রা.) এক গভীর রাতে মদিনার একটি পথ অতিক্রম করছিলেন জনগণের অবস্থা জানার জন্য। এটি তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস ছিল। পথ চলার মাঝে একটি ঘর থেকে কথাবার্তার কিছু মৃদু শব্দ শুনতে পেলেন। থমকে দাঁড়ালেন বিশ্ব মুসলিম জাহানের খলিফা হয়রত ওমর ফারুক (রা.) জানতে চাইলেন কেউ কোনো বিপদে পড়েছে কিনা? কান পেতে শুনতে পেলেন : এক মহিলা তার মেয়েকে ডেকে বলছে, মা দুধে পানি মিশাও সকাল বেলায় বিক্রি করতে হবে। তাহলে একটু বেশী লাভ করা যাবে। মেয়েটি বললো : মা! আমি দুধে পানি মিশাতে পারব না। কারণ হলো খলিফা ওমর (রা.) আদেশ দিয়েছেন দুধে পানি মিশানো যাবে না।

মা বললো মেয়েটি আমার গিয়ে দেখ, খলিফা ওমর (রা.) জনমের মতো ঘুমাচ্ছেন, সেতো দেখবেও না, শুনবেও না, তাড়াতাড়ি পানি মিশাও।

মেয়েটি বললো : খলিফা ওমর (রা.) দেখছেন না, তাঁর চোখকে ফাঁকি দেয়া যেতে পারে ঠিক আছে কিন্তু তোমার আমার স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের চোখ তো ফাঁকি দেয়া যাবে না। তিনি সবকিছু শোনেন এবং দেখেন। সুতরাং আমি একাজ করতে পারব না।

খলিফা ওমর (রা.) স্বয়ং নিজ কানে মা ও মেয়ের কথোপকথন শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং চিন্তা করতে লাগলেন কি দিয়ে মেয়েটিকে দুনিয়ার জীবনে পুরস্কৃত করা যেতে পারে। অবশেষে অর্ধ পৃথিবীর শাসক হযরত ওমর (রা.) নিজ পুত্রের সাথে মেয়েটির বিয়ে দিয়ে পুরস্কৃত করলেন। আর সে মেয়ের ঘরে যে মেয়ে জন্ম গ্রহণ করেন ইসলামের পঞ্চম খলিফা হযরত ওমর ইবনুল আবদুল আজিজ (রহ.) সেই মেয়ের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন।

হযরত মাগির ইবনে মালিক (রা.) আল্লাহর রাসূল (স.) এর কাছে এসে অনুতাপ মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন : আমি অবৈধ পন্থায় যৌনক্রিয়া করেছি, আমার প্রতি

www.amarboi.org

দণ্ডারূপ করুন; রাসূল (স.) তাকে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন : তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। লোকটি চলে গেলো। মনে কোনো প্রশান্তি পাচ্ছিলো না। পর পর তিনবার রাসূলের নিকট আসলো দুনিয়াতেই শাস্তি পাওয়ার জন্য। যখনই সে আল্লাহকে স্মরণ করে তখনই ভীত হয়ে রাসূলের নিকট চলে আসে শাস্তি পাওয়ার জন্য এবং তিনবারই রাসূল (স.) তাকে ফিরিয়ে দিলেন। চতুর্থবার যখন লোকটি আসলো শাস্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর রাসূল (স.) তখন জানতে চাইলেন, লোকটি কোনো ধরনের নেশা করেনিতো?' লোকজন বললো 'না' লোকটি কোনো নেশা করেনি। রাসূল আবার জানতে চাইলেন লোকটি কোন নেশা করেনি তো? লোকজন বললো 'না'। লোকটি কোন নেশা করেনি। এরপর লোকটিকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হলো। রাসূল (স.) সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা মাগির ইবনে মালিকের জন্য মাগফিরাত কামনা করো। কারণ সে এমন তওবা করেছে যে, তাঁর তাওবা সমস্ত মানুষের মধ্যে বণ্টন করে দিলে তাই যথেষ্ট হতো।"

মুমিন সমাজের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, উপরোল্লিখিত দু'টি ঘটনা হলো প্রকৃত খোদাভীতি, আপনার পিছনে কোন পুলিশ থাকবে না, আইন শৃঙ্খলার কোন সদস্যই আপনার পিছনে থাকবে না। কোনো গোয়েন্দা নজর থাকবে না। এরপরও আপনি এক আল্লাহকে স্মরণে রেখে সকল ধরনের অপকর্ম থেকে বিরত থাকবেন। কেননা আল্লাহর নজরদারিতাকে যদি আপনি ভয় না করেন, আপনি যদি আল্লাহর উপস্থিতিকে উপলব্ধি না করেন, তাহলে কখনই আপনি অপরাধ থেকে বাঁচতে পারবেন না। পৃথিবীর যে কাউকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব কারণ সেও তো আপনার মতো একজন মানুষ। তাই একজন মুমিন সার্বক্ষণিক আল্লাহকে স্মরণে রেখে তাঁর আযাবকে ভয় করে দিনাতিপাত করে থাকে।

মুমিনের ঈমান আল্লাহর আয়াতের সম্মুখীনে বেড়ে যায়

মুমিনের সামনে যখন আল্লাহর কোনো আয়াত বা হুকুম আসে এবং সে তা মেনে নিয়ে আনুগত্যের শির নত করে দেয় তখনই তার ঈমান বেড়ে যায়। পবিত্র কোরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

And when they hear His revelations rehearsed, find their faith strengthened.

www.amarboi.org

"আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের (মুমিনদের) সামনে পড়া হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়।" (সূরা আল আনফাল : ২)

যখনই আল্লাহর কিতাব ও তাঁর প্রিয় রাসূলের হেদায়াতের মধ্যে মুমিন এমন কোনো জিনিস দেখে, যা তার ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-ভাবনা, মতবাদ, আচার-আচরণ, স্বার্থ, আরাম-আয়েশ, ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব বিরোধী হয় এবং সে তা মেনে নিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম পরিবর্তন করার পরিবর্তে নিজেকে বা নিজের ইচ্ছাকে পরিবর্তিত করে ফেলে এবং তা গ্রহণ করতে গিয়ে কষ্ট স্বীকার করে নেয়, তখন মুমিনের ঈমান আরও তরতাজা ও পরিপুষ্ট হয়। আর তখন সৃষ্টি হয়ে যায় আত্ম-সম্মান ও মর্যাদা এবং এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নত না করার প্রবণতা।

ব্যক্তি যখন পরিপূর্ণ মুমিন হয়ে যায় তখন সে আয়াতের সম্মুখীন হলে ঈমান তার আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। যার ফলে সে আরও সম্মানজনক শক্তির অধিকারী হয়ে যায় এবং তার মধ্যে আত্ম-সম্মান পয়দা হয়ে যায়। আর তখন সে শুধুমাত্র এক আল্লাহর সামনেই মাথা নত করতে শিখে।

এক মুশরিক এসেছিল আল্লাহর রাসূলের সামনে একটি ভাঙ্গা মূর্তি নিয়ে। এসে বললো হে আল্লাহর রাসূল (স.) এ মূর্তিটি ছিল আমার খোদা আমি এর ইবাদত করতাম। আমি যেখানেই যেতাম সেখানেই আমি একে নিয়ে যেতাম এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম যে, এ আমাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবে। প্রতিদিনের ন্যায় আজও আমি তাকে নিয়ে পথ চলছিলাম। পথিমধ্যে আমার প্রাকৃতিক ডাক আসলো। চিন্তা করলাম এত নীচু কাজ করতে গিয়ে খোদাকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তাই আমি রাস্তার পাশে খোদাকে দাঁড় করিয়ে কাজ সারতে চলে গেলাম।

কাজ সেরে এসে দেখলাম খোদার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একদম ভেজা। চিন্তা করলাম খোদার শরীর ভেজা অবশ্যই বরকতের পানি হবে, তাই চাটা আরম্ভ করলাম। চাটতে গিয়ে দেখি যেন টক টক এবং ঝাঝালো গন্ধ। ভাবলাম যদি বরকতের পানি হয় তাহলে এমন গন্ধ হবে কেন? চতুর্দিকে তাকাতে লাগলাম, তাকাতে গিয়ে দেখলাম রাস্তার পাশে একটি কুকুর দাঁড়ানো। কুকুরটির লিঙ্গ থেকে পানি টপকাচ্ছে। তখন আর বুঝতে বাকি রইল না এ কোন বরকতের পানি। হুজুর মেজাজটা খারাপ হয়ে গেলো। খোদার সামনে গিয়ে পা দু'খানা ধরে একটা আছাড় দিলাম আর বললাম তুমি কি খোদা নাকি আস্ত একটা হুদা! তুমি

www.amarboi.org

কুকুরের প্রস্রাব হতে নিজেকে বাঁচাতে পারলে না আর আমাকে বিপদ থেকে বাঁচাবে কিভাবে?

নবীজি হেসে দিলেন। হাদীসে এসেছে এই প্রথম যে, হাসতে গিয়ে হুজুর (স.) এর দন্ত মোবারক বিকশিত হলো। রাসূল (স.) বললেন : তোমার এই ভাঙ্গা মূর্তি নিয়ে এখন কেন এসেছ? লোকটি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহি (স.) আজ আমি নিজেকে বুঝতে পেরেছি এত দিন আমি ভুলে ছিলাম, যেগুলোর সামনে এতদিন মাথা নত করেছি এগুলো আসলে কিছুই নয়, আপনি আমাকে আজ আলোর পথ দেখিয়ে দিন। হুজুর (স.) বললেন তাহলে পড় আমার সাথে–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

মুমিন এক আল্লাহর ওপরই ভরসা করে

মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হবে সে এক আল্লাহর ওপর ভরসা করবে, পৃথিবীর কোন শক্তিকেই পরোয়া করবে না, কারো অগ্নিচক্ষুকে সে ভয় পাবে না। যালিম শক্তির বিরুদ্ধে যালিম শক্তির সামনেই সে কথা বলতে দ্বিধা করবে না। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন শক্তি তথা রাজা-বাদশা, শাসক গোষ্ঠী, ধর্মীয় নেতৃত্ব বা সমাজের কোনো শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গের সামনে মুমিন মাথা নত করতে জানবে না।

আমরা যদি বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.) এর সময়ের মুমিনদের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে, ঈমানী চেতনা তাঁদের হৃদয় ও দৃষ্টিকে আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল জাগতিক সৌন্দর্য ও আকর্ষণ, পৃথিবীতে চিত্তভোলা দৃশ্য ও প্রতারণাকারী বস্তুসমূহ এবং সাজ-সরঞ্জামের প্রদর্শনীর কোনো মূল্যই তাদের দৃষ্টিতে ছিলো না। তাঁরা যখন বিশ্ব-শাসক গোষ্ঠীর জাঁকজমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির এবং তাদের দরবারের সাজ-সজ্জার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন, তাঁরা দেখতেন এসব শাসকগোষ্ঠী জাগতিক সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে পরম তুষ্ট হয়েছে কিন্তু তাঁদের কাছে মনে হতো, এসব রাজা-বাদশাহ যেন মাটির বানানো পুতুল-যাদেরকে মূল্যবান পোশাকে আবৃত করে সিংহাসনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। রাজদরবারে যাতায়াতকালে অজ্ঞ লোকগুলো সে সাজানো মনিবরূপি মূর্তিগুলোর সামনে মাথা নত করতো। রাজদরবারে যাতায়াতকারী লোকগুলো যখন রাজা-বাদশাকে সিজদা করত তখন রাজদরবারে দাঁড়িয়ে এক নাজুক পরিস্থিতিতে হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.)

www.amarboi.org

আপোষহীন কণ্ঠে সিংহের ন্যায় গর্জে ওঠে বললেন : "আমাদের মাথা একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ব্যতীত অন্য কারো সামনে নত হয় না।"

এমন পরিস্থিতিতে এমন বিপ্লবী ঘোষণা দিতে পারে একমাত্র মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসাকারী মুমিন ব্যক্তিরাই, কারণ সে বিশ্বাস করে خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى. "ভালো হোক মন্দ হোক সবই আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে"। আল্লাহর ওপর যিনি নির্ভর করতে পারেন পূর্ণভাবে তিনি কখনো নিরাশ হন না, হতাশ হন না, পিছু হটেন না। আল্লাহ তায়ালা অদৃশ্য হতে তাঁকে এমনভাবে সাহায্য করে থাকেন যা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। অবশেষে তিনি শুধু আল্লাহর কুদরতি পায়ে সিজদাই করতে জানেন।

হযরত আয়ুব (আ.) এর ১৮টি বছরের জীবনের দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারবো আল্লাহর ওপর ভরসা কাকে বলে। হযরত আয়ুব (আ.) দীর্ঘ আঠারোটি বছর রোগে-শোকে দিনাতিপাত করছিলেন। সকল অর্থ-সম্পদ হারিয়ে ফেললেন। পুরো দেহে পঁচে পোকা ধরে ফেললো। ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী আত্মীয়-স্বজন সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে গেলো। আল্লাহ ছাড়া তাঁর এখন আর কেউ নেই। তবুও কিঞ্চিৎ পরিমাণও মহান আল্লাহর ওপর থেকে ভরসা হারালেন না। শুধু কেবল যখনই জিহ্বাতেও পোকা ধরে ফেললো, তখন শুধু এতটুকুই বললেন যা আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনুল কারীমে রেকর্ড করে দিয়েছেন–

إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ أَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعَابِدِيْنَ.

When cried to the lord 'Truly distress has seized me, but thou art the most merciful of those that are Merciful. So we listened to him : We removed the distress that was on him, and we restored his people to him, and doubled their number, as a Grce from ourselves, and a thing for commemoration, for all who serve us.

"(স্মরণ করো) যখন সে তার রবকে ডাকলো, 'আমি রোগাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি এবং তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাকারী। আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম, তার যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিয়েছিলাম এবং শুধুমাত্র তার

www.amarboi.org

পরিবার-পরিজনই তাকে দেইনি বরং এই সাথে এ পরিমাণ আরো দিয়েছিলাম, নিজের বিশেষ করুণা হিসেবে এবং এজন্য যে, এটা একটা শিক্ষা হবে ইবাদতকারীদের জন্য"। (সূরা আল আম্বিয়া : ৮৩-৮৪)

অবশেষে আল্লাহ তায়ালা হযরত আয়ুবের (আ.) সকল ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও সুস্থতা ফিরিয়ে দিলেন। লক্ষ্য করুন সম্মানিত পাঠক, হযরত আয়ুব (আ.) বেশী কিছু বললেন না। শুধু বলেছেন 'আমি অসুস্থ আর তুমি রহমানুর রাহীম। অমনিতেই আয়ুবের ডাক আল্লাহর আরশে আযীমে পৌঁছে গেলো। একজন ভিক্ষুক ঈদের দিনে ঈদগাহের গেটে দাঁড়িয়ে বললো : 'হায়রে আজ ঈদের দিন সবাই কতোই না আনন্দ করছে আর আমি চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না; একথার সাথে সাথে দেখা গেলো অন্যান্য সকল ভিক্ষুকের চাইতে সে ভিক্ষুকই বেশী টাকা পেলো। ভিক্ষুকটি কিন্তু বেশী কিছুই বলেনি। যে কোন কথার বাচনভঙ্গি ও রচনাশৈলী যদি আকর্ষণীয় হয় তাহলে কথা বেশী বলতে হয় না। অল্প কথাতেই আশা পূরণ হয়ে যায়। হযরত আয়ুব (আ.) আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে যখন এতটুকুন কথা বললেন যে, আমি অসুস্থ আর তুমি রহমানুর রহীম। আর অমনিতেই আল্লাহ তায়ালা তার প্রার্থনা কবুল করলেন।

সুতরাং মুমিন যতই দেখুক না কেন যে, চতুর্দিক থেকে অন্ধকার অমানিশা নেমে আসছে, তাগুতের দীর্ঘ হুঙ্কার, প্রতারকদের কঠিন ষড়যন্ত্র, চতুর্দিকে অস্ত্রের ঝনঝনানি এসব কিছুর আড়ালে সে দেখতে পাবে আশার আলো। সে বিশ্বাস এবং আশা করবে এ সকল অন্ধকার কেটে গিয়ে ভোর হবেই এবং আলোকময় লাল সূর্য উদিত হবেই হবে ইনশাআল্লাহ। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল এসেছেন সবাই তাগুতের আঘাতে নির্যাতিত হয়েছেন। কঠিন থেকে কঠিন মুহূর্ত পার করেছেন আর উত্তরে নির্যাতনকারীদের বলেছিলেন তোমরা যত ইচ্ছা নির্যাতন কর, আমরাতো কেবল এক আল্লাহর উপরই ভরসা করবো।

মুমিন নামায কায়েম করে

যেই কোন মানুষ পবিত্র কোরআনুল কারীম শুধুমাত্র মেনে নিয়ে বসে থাকলে সে কখনো কোরআন থেকে উপকৃত হতে পারবে না। বরং এর ওপর ঈমান আনার সাথে সাথে তার আনুগত্যও করতে হবে। কোরআনুল কারীমের বাস্তব আনুগত্যের প্রধান ও স্থায়ী বহিঃপ্রকাশ হলো নামায। ব্যক্তি যখনই ঈমান আনে

www.amarboi.org

সংগে সংগেই যে কাজটি তার উপর ফরয হয় তা হলো নামায। মুয়াযযিন দৈনিক পাঁচবার এই আনুগত্যের জন্য আহ্বান করে। যখনই ব্যক্তি তাঁর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে বসে থাকে, তখনই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈমানের দাবিদার ব্যক্তি আনুগত্যের আওতা থেকে বেরিয়ে পড়লো। একথাটি জেনে রাখা অত্যন্ত জরুরী যে, নামায কায়েম করা ব্যাপক ও পূর্ণ অর্থবোধক একটি পরিভাষা। এর অর্থ কেবল একাকী নিয়মিত নামায পড়া নয় বরং সামষ্টিকভাবে নামাযের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করাই এর অর্থ। যদি কোথাও ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি নামায আদায় করে কিন্তু জামায়াতের সাথে এ ফরযটি আদায় করার ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহলে সেখানে নামায প্রতিষ্ঠিত আছে বলা যাবে না এবং একাকী নামায আদায়কারী অথবা নামাযে অবহেলাকারী ব্যক্তিরা মুমিন তাও বলা যাবে না। কেননা, মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হবে সে নামায প্রতিষ্ঠা করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন–

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ. أُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا.

Who establish regular prayers and spend (freely) out of the gifts we have given them for sustenance: Such in truth are the Believers.

"তারা (মুমিনরা) নামায কায়েম করে এবং যা কিছু তাদেরকে দান করেছি তা থেকে আমার পথে দান করে। এ ধরনের লোকেরাই প্রকৃত মুমিন।" (সূরা আল আনফাল : ৩-৪)

মুমিন যখন যে গণ্ডিতে থাকে তখন সে গণ্ডিতে নামায প্রতিষ্ঠা করবে অর্থাৎ শুধু পরিবারে ক্ষমতা থাকলে পরিবারে নামায প্রতিষ্ঠা করবে, সমাজে ক্ষমতা থাকলে সমাজে নামায প্রতিষ্ঠা করবে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকলে রাষ্ট্রীয়ভাবে নামায প্রতিষ্ঠা করবে। সর্বোপরি মুমিন ব্যক্তি নিজে ব্যক্তি জীবনে নামাযে সক্রিয় থেকে অন্যদেরও নামাযে অভ্যস্ত করে মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভ করবে।

দুনিয়ার কারাগারে কেউ প্রবেশ করলে তাকে অন্যরা জিজ্ঞেস করে তুমি কেন কারাগারে এলে? অনুরূপভাবে পরকালে জাহান্নামে নিপতিত হওয়া ব্যক্তিরা একে অন্যকে জিজ্ঞেস করবে তুমি কেন এ ভয়াবহ আযাবের স্থানে এলে? বেনামাযী বলবে তার নামায না পড়াই জাহান্নামের প্রবেশের কারণ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন–

www.amarboi.org

يَتَسَآءَلُوْنَ ــ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ــ مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ــ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ــ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ــ

They will question each other- And of the Sinners what led you into Hell fire? They will say we were not of those who prayed, Nor were we of those who feed the indigent.

"সে দিন তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে তোমাদেরকে আজ কি কারণে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাবে উপনীত করেছে? তারা বলবে আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না এবং (ক্ষুধার্ত ও) অভাবীদের খাবার দিতাম না।" (সূরা আল মুদ্দাসসির : ৪০-৪৪)

একটি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সকল ধরনের অপরাধ থেকে মুক্ত রাখার জন্য যে কাজটি প্রথমেই করতে হবে সেটি হলো নামায প্রতিষ্ঠা করা। নামাযই পারবে একটা কিশোর থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকল শ্রেণীর মানুষকে অন্যায়-অপরাধ থেকে দূরে রাখতে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন–

اُتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ.

Recite what is sent of the Book by inspiration to thee, and extablish regular prayer, for prayer restrains from shameful and evil deeds.

"এ কিতাব তিলাওয়াত করুন, যা অহীর সাহায্যে আপনার নিকট অবতীর্ণ করা হয়েছে, আর নামায কায়েম করুন নিঃসন্দেহে নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। (সূরা আল আনকাবূত : ৪৫)

এ প্রসঙ্গে বিশ্বনবী (স.) বলেছেন–

হযরত আবী দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স.) আমাকে অসিয়্যত করেছেন, "আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক স্থাপন করবে না, যদিও তোমাকে কেউ কেটে টুকরা টুকরা করে ফেলে অথবা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয় ইচ্ছাপূর্বক ফরয নামায ত্যাগ করবে না, যে ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করে, তার ওপর থেকে আল্লাহ তায়ালার সেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়, যে দায়িত্ব

www.amarboi.org

ঈমানদারের প্রতি আল্লাহ তায়ালার রয়েছে। মদ পান করবে না কারণ মদ সকল নিকৃষ্ট পাপের চাবি।" (ইবনে মাজাহ)

আল্লাহর রাসূল (স.) যখন জীবনের শেষ সীমায় এসে পৌছলেন, কখনো হুঁশ, কখনো বেহুঁশ অবস্থায় কাতরাচ্ছেন। নামাযের সময় হলে সাহাবারা (রা.) মসজিদে বসে বসে প্রিয় নবীজীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। একপর্যায়ে উপস্থিত সকল সাহাবীদের পরামর্শে হযরত আবু বকর (রা.) নামাযের ইমামতি শুরু করলেন। আল্লাহর রাসূলের (স.) যখন হুঁশ এলো তখন হযরত আয়েশাকে বললেন : এখন কোন সময়? হযরত আয়েশা (রা.) বললেন : নামাযের সময় হয়েছে, আমার বাবার ইমামতিতে সকল সাহাবী নামাযে দাঁড়িয়েছেন। বিশ্বনবী (স.) বললেন : আয়েশা আমার মাথাটি একটু উঁচু করে ধর, আমি একটু নামাযের দৃশ্যটা দেখি।

হযরত আয়েশা বিশ্বনবীর মাথাটা উঁচু করে ধরলেন। মৃত্যু পদযাত্রি পৃথিবীর সেরা মানুষ রাহমাতুল্লিল আলামীন নামাযের জামায়াতের দৃশ্য অবলোকন করলেন। দেখার পর হযরত আয়েশাকে বললেন : এবার মাথাটি নিচে রাখ। হযরত আয়েশা (রা.) নিজ উরুর উপর রাসূলের (স.) মাথা রাখলেন। রাখার পর দেখলেন নবীজীর দু'চোখের কোণা দিয়ে পানি পড়ছে। হযরত আয়েশা (রা.) কান্নার রহস্য জানতে চাইলে বিশ্বনবী বললেন, আয়েশারে এটি কোনো দুঃখের পানি নয় বরং এটি হলো তৃপ্তির পানি।

সাহাবীদেরকে নিয়ে যে নামাযের জামায়াতের জন্য আমি যুদ্ধ করেছি, তায়েফের ময়দানে রক্তাক্ত হয়েছি, উহুদের ময়দানে আমাকে দাঁত হারাতে হয়েছে, সে জামায়াত দেখে আমি আজ বড়ই তৃপ্তি পেয়েছি। আমার আত্মবিশ্বাস এসেছে কেয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতেরা জামায়াত প্রতিষ্ঠিত রাখবে।

মুমিন আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে দান করে

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা মুনাফিকূন এ ইরশাদ করেছেন–

وَأَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ.

And spend something (in charity) out of the substance which we have bestowed on you before Death should come to any of you. and he should say.

www.amarboi.org

"আমি তোমাদের যে রিযিক দিয়েছি, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই তোমরা তা থেকে খরচ কর।" (সূরা মুনাফিকূন : ১০)

মৃত্যুর আলামত যখন শুরু হয়ে যায়, তখন আর কারো সাধ্য থাকে না যে, কাযা নামায, রোযা ও হজ আদায় করে নিবে। আর ধন-সম্পদ টাকা-পয়সা সামনে উপস্থিত থাকে, আর সে বুঝে যে, এখন তার এ ধন-সম্পদ তার হাতছাড়া হয়ে যাবে তাই সে আর্থিক শারীরিক ইবাদতের দোষ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মরণের মুহূর্তে বলে এই পরিমাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও, এই পরিমাণ সম্পদ অমুক কাজে লাগাও। কারণ একটু পরেই এ বিশাল সম্পদের কিছুই তার কাজে লাগবে না। শুধু অতটুকু ছাড়া যা তাকে বিদায় দিতে প্রয়োজন হবে। স্কয়ার কোম্পানীর মালিক মি. স্যামসন চৌধুরী পৃথিবীতে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার সম্পদের মালিক ছিলেন। তার মৃত্যুর পর সিদ্ধান্ত হলো মি. স্যামসন চৌধুরীকে পৃথিবী থেকে বিদায় দিতে যা কিছু ব্যবহৃত হবে সবই সর্বোচ্চ দামী জিনিস ব্যবহার করা হবে। ব্যবহার করা হলো সর্বোচ্চ দামী জিনিস। হিসাব করা হলো, কত টাকা খরচ করা হলো, দেখা গেলো মাত্র চার হাজার টাকা খরচ হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন। একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (স.) এর নিকট আরজ করলো, কোন দানে আল্লাহ তায়ালা বেশী খুশি হন? তিনি (রাসূলুল্লাহ স.) বললেন : "যে সাদাকা বা দান সুস্থ অবস্থায় এবং গরীব হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকার অবস্থায় করা হয়।" নবী করীম (স.) আরো বললেন : "আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে সেই সময় পর্যন্ত বিলম্ব করো না, যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত এবং তুমি মরতে থাকো। আর বলো এই পরিমাণ অর্থ এই ব্যক্তিকে দাও, এই পরিমাণ সম্পদ ঐ কাজে লাগাও। (বুখারী ও মুসলিম)

মানুষের ন্যাচার প্রচুর ধন-সম্পদের আশায় কবরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সে ব্যস্ত থাকে এবং যার ফলে সে আল্লাহকে পর্যন্ত ভুলে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ـــ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ـــ

The mutual rivalry for piling up diverts you— Until visit the graves.

"প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে এমনভাবে গাফেল করে রাখে যে, তোমরা কবর পর্যন্ত পৌঁছে যাও।" (সূরা আত তাকাসুর : ১-২)

সম্পদ অর্জনে ইসলামের কোনো বাধা নেই যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে তা অর্জন করা যায়। তবে পাশাপাশি শুধু অর্জনের পিছনেই নিজেকে ব্যস্ত রাখলে চলবে না বরং

www.amarboi.org

আল্লাহর পথে বর্জনেরও চিন্তা-চেতনা থাকতে হবে। অর্জিত প্রাচুর্যের গর্বে এবং আরো অধিক অর্জনের প্রতিযোগিতায় যারা ডুবে আছে যে, একদিন এসব সম্পদ ত্যাগ করে সংকীর্ণ একটা গর্তে আশ্রয় নিতে হবে, তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, শুনো! প্রতিযোগিতা ও অহংকার এবার থামাও, জাগো এবং চোখ মেলে তাকাও : অতিরিক্ত অর্জনের নেশা ও হাত গুটিয়ে রাখা তোমাদেরকে উদাসীন করে দিয়েছে। কবরের সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্যন্ত তোমাদের এ অবস্থাই চলতে থাকবে।

একজন মুমিন সর্বদা এর বিপরীত হবে। সে সঠিক পন্থায় সম্পদ আয়ের পাশাপাশি সর্বদা আল্লাহর পথে ব্যয় করাতেই পরিতৃপ্ত থাকবে। সে বিশ্বাসী হবে নিজে যা খায় তা শেষ হয়ে যায় আর অন্যকে যা খাওয়ানো হয় তা থেকে যায়। বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সাইয়েদ কামাল উদ্দিন আবদুল্লাহ জাফরী বলেছিলেন যে, 'আমি এমন এক ব্যক্তি যার ওপর যাকাত ফরয হয় না; আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম তাঁর মুখেই তাঁর এমন বক্তব্য শুনে, কারণ আমি মোটামুটিভাবে তাঁর আয়ের উৎসগুলো জানি। এর একমাত্র কারণ হলো তিনি শুধু সম্পদ আয়ই করেননা বরং আয়ের পাশাপাশি ব্যয়ও করেন আল্লাহর পথে। বস্তুত এটি হলো একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

মুমিন রবের আয়াতের প্রতি ঈমান আনে

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনুল কারীমে বলেন–

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ــ

Those who believe in the Signs of their Lord.

"আর যারা নিজেদের রবের আয়াতের প্রতি ঈমান আনে (তারা মুমিন)।" (সূরা মুমিনূন : ৫৮)

এখানে আয়াত বলে দু'ধরনের আয়াতকে বুঝানো হয়েছে। এক. যেসব আয়াতগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তার নবীগণ অহীর মাধ্যমে লাভ করে পেশ করেছেন, দুই. যেসব আয়াতগুলো মানুষের নিজের মনের বা বিবেকের মধ্যে এবং বিশ্ব চরাচরে চারদিকে ছড়িয়ে আছে। অহীর আয়াতের প্রতি ঈমান আনা প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর সত্যতা স্বীকৃতি দেয়া এবং বিশ্ব চরাচর ও মানব বিবেকের আয়াতের তথা নিদর্শনাবলীর প্রতি ঈমান আনা প্রকৃতপক্ষে সেগুলো যেসব সত্য প্রকাশ করছে সেসব সত্যকে আল্লাহর নিদর্শনা বলে স্বীকার করা।

মোটকথা হলো রবের আয়াতের প্রতি ঈমান আনয়ন করা প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর

www.amarboi.org

সত্যতার স্বীকৃতি দেয়া। আর তাঁর নিদর্শনাবলীর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো, সেগুলো যেসব সত্য প্রকাশ করছে তার প্রতি ঈমান আনাই প্রমাণ করে, একজন মুমিন সকল ধরনের দুর্বলতা থেকে মুক্ত হয়ে একবার স্বীকৃতি দিবে যে, এ পৃথিবীতে যা কিছু দেখা যায় এবং যা কিছু দেখা যায় না- সবই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই এসব কিছু পরিচালনা করেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে এ পৃথিবীর কেউ দেখতে পারেনি, দেখতে পাচ্ছে না এবং কখনো দেখতে পারবে না। হযরত মূসা (আ.) প্রার্থনা করেছিলেন আয় আল্লাহ তায়ালা আমি আপনাকে একটু দেখতে চাই, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছিলেন لَنْ تَرَانِىْ. (তুমি কিছুতেই আমাকে দেখতে পারবে না)। অনর্থক প্রার্থনা করিওনা বরং কাজ করতে থাক এবং আমার গুণাবলীর দ্বারা, কার্যাবলীর দ্বারা নিদর্শনাবলীর দ্বারা আমার পরিচয় লাভ করো।

একজন মানুষ যদি তার নিজ দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি যেমন– শ্বাসতন্ত্র, রক্ত সংবহনতন্ত্র, মস্তিষ্ক, ফিংগার প্রিন্ট, ডিএনএ, জিহ্বা ও তার আস্বাদন, মানবকোষ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য করে আর চিন্তা করে এগুলোর কার্যক্রম নিয়ে, তাহলে সে অনায়াসেই বলে উঠবে- অবশ্যই সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন যিনি এসব কিছু স্থাপন করেছেন। কোন গ্রাম্য লোক-বেদুঈন, পড়া-লেখা জানেনা, সে যদি কোন বন-জঙ্গল অতিক্রম করে আর সে যদি দেখে কোন জায়গায় ছাগলের লাদি পড়ে আছে তখন সে অনায়াসেই বুঝতে পারে এখানে অবশ্যই ছাগল এসেছিল। কোন মানুষের পায়ের চিহ্ন দেখলে সে বুঝতে পারে যে, এখানে মানুষ এসেছিল। তাহলে ঐ মহা আকাশ, বিস্তৃর্ণ যমীন, সীমাহীন গভীর সমুদ্র, গাছ-পালা তরু-লতা, পাহাড়-ঝর্ণা, মেঘ-বৃষ্টি ইত্যাদি দেখে জ্ঞানবানরা কি বিশ্বাস করবে না যে, একজন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আছেন যিনি এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন?

মানুষকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত করানোর জন্য সৃষ্টি জগতের সর্বত্রে অগণিত আয়াত বা নিদর্শন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তা দেখে কেউ আল্লাহকে খুঁজে পাবে আবার কেউ মূর্খতাবশত অস্বীকার করবে। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়া জালাল পবিত্র কোরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন–

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُوْرًا.

We showed him the way whether he be grateful or ungrateful.

www.amarboi.org

"আমি তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি। এরপর হয় সে শোকর গোজার হবে নয়তো হবে কুফরের পথ অনুসরণকারী।" (সূরা আদ দাহর : ৩)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে খুঁজে পাওয়ার মতো অসংখ্য জিনিস আমাদের চার পাশে বিরাজমান। তা প্রত্যক্ষ করার জন্য শুধু একটি আলাদা চক্ষুর প্রয়োজন। যে চক্ষুর নাম হলো অন্তর বা হৃদয়। অন্তরটি যদি সুস্থ থাকে তাহলে অনায়াসেই আল্লাহর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা সৃষ্টিকুলের মাঝে মানুষ আল্লাহকে খুঁজে পাবে, আর যদি অন্তর নামক চক্ষুটি অসুস্থ বা অন্ধ হয়ে থাকে তাহলে কখনোই আল্লাহর অস্তিত্ব খুঁজে পাবে না। এজন্যই শিল্পি তার কোকিল কণ্ঠে গেয়ে যায়-

তুমি রহমান– তুমি মেহেরবান,

অন্ধ গাহে না শুধু তোমার গুণগান।

মুমিন রবের সাথে কাউকে শরীক করে না

যুলুম হলো ইনসাফের বা আদলের বিপরীত। আল্লাহ তায়ালাই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এ সৃষ্টিতে তাঁর কেউ শরীক নেই। অতএব ইনসাফ হলো এককভাবে তাঁরই ইবাদত করা। এক্ষেত্রে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা হবে সবচে বড় যুলুম। বলতে গেলে পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম নীতি হলো তাওহীদ আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হলো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যা পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্যতম অধিকার হরণ এবং যুলুম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ط إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

Join not in worship (others) with Allah: for false wordhip is indeed the highest wrong-doing.

"আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, কেননা, শিরক হলো সবচেয়ে বড় (জঘন্যতম) যুলুম।" (সূরা লোকমান : ১৩)

সন্তান পিতা-মাতার সাথে অনেক ধরনের অপরাধই করে থাকে, কথা শুনে না, সম্পদ নষ্ট করে, দুর্ব্যবহার করে আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপরীত জীবন গড়ে। এরপরেও ক্ষমা চাইলে পিতা-মাতা সন্তানকে ক্ষমা করে দেন, কিন্তু যখনই সন্তান তার পিতা-মাতার সত্তার ওপর আঘাত করে তখন কিন্তু আর ক্ষমার দরজা খোলা রাখেন না এবং ক্ষমা করে না। অনুরূপভাবে বান্দা আল্লাহর সাথে অনেক ধরনের পাপ করে থাকে। নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, পর্দা করে না, তাঁর বিধান মত

www.amarboi.org

পরিবার/সমাজ/রাষ্ট্র পরিচালনা করে না, বিচারালয় চালায় না, চুরি করে, ডাকাতি করে, মিথ্যা কথা বলে। এই ছাড়াও অসংখ্য অপরাধ করে থাকে, কিন্তু এই সকল বড় বড় অপরাধ করে যদি কবরে চলে যায় তাহলে আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে অন্য কোন পুণ্য কাজের বিনিময়ে তাঁর রহমতে মাপ করে দিতে পারেন বা এই সকল অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়ে সর্বশেষ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাত দান করতে পারেন। কিন্তু শিরক হলো এমন এক জঘন্য অপরাধ যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোনো মতেই ক্ষমা করবেন না এবং শিরককারীকে স্থায়ী জীবনের জন্য জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِه وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى إِثْمًا عَظِيْمًا.

Allah for giveth not that partnershould be set up with Him but He forgiveth anything else, to whom he pleaseth, to set up partners with Allah is to Devise a sin most heinous indeed.

"আল্লাহ অবশ্যই শিরককে মাফ করেন না। এছাড়া অন্যান্য যত গোনাহই হোক না কেন তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করেছে সেতো এক বিরাট মিথ্যা রচনা করেছে এবং কঠিন গোনাহের কাজ করেছে।" (সূরা আন নিসা : ৪৮)

এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ কেবলমাত্র শিরক করবে না এবং বাদবাকি গুনাহ করে যেতে থাকবে প্রাণ খুলে। বরং এ থেকে একথা বুঝানো হয়েছে যে, শিরকের গুনাহকে তারা মামুলি গুনাহ মনে করে এসেছে। অথচ এটিই সবচেয়ে বড় গুনাহ। এমনকি অন্য সমস্ত গুনাহ মাফ হতে পারে কিন্তু এই গুনাহটি মাফ করা হবে না। ইহুদী আলেমরা শরীয়তের ছোট ছোট বিধি-নিষেধ পালনের ওপর বড় বেশী গুরুত্ব দিতেন। বরং তাদের সমস্ত সময় এসব ছোট খাটো বিধানের পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাইয়ে অতিবাহিত হতো, তাদের ফকিহগণ এই খুঁটি-নাটি বিধানগুলো বের করে ছিলেন ইজতিহাদের মাধ্যমে। কিন্তু তাদের চোখে শিরক ছিল একটি হালকা ও ছোট গুনাহ। তাই এই গুনাহটির হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা কোনো প্রকার চিন্তা ও প্রচেষ্টা চালাননি। নিজেদের জাতিকে মুশরিকি কার্যকলাপ থেকে বাঁচার জন্য কোনো উদ্যোগও তারা নেননি। মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতাও তাদের কাছে ক্ষতিকর মনে হয়নি।

www.amarboi.org

চলনে-শয়নে, গ্রহণে-বর্জনে, বলনে-নয়নে, সকল স্থানেই একমাত্র আল্লাহর তাওহীদকে লালন করতে হবে। দাসত্ব ও আনুগত্যের একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহ তায়ালা। তাঁর সামনেই মাথানত করতে হবে। আনুগত্যের মস্তক একমাত্র তাঁর সামনেই নত করে দিতে হবে। ইবাদত-বন্দেগি, জীবন-মরণ সকল কিছু শুধুমাত্র-কেবলমাত্র একমাত্র আল্লাহর জন্যই হতে হবে, এখানে কাউকে বা কোন কিছুকে সম্পৃক্ত করা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

قُلْ إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Say : Truly, my prayer and my services of sacrifice, my life and my death, are (all) for Allah, the Cherisher of the worlds.

"বল আমার নামায, আমার কোরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।" (সূরা আল আনআম : ১৬২)

এই ক্ষেত্রে মুমিন কাউকে অংশীদারিত্ব করবে না। লক্ষ্য স্থির করার ক্ষেত্রে মুমিন কোনো দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করবে না। কেননা, সে নিজেকে একমাত্র আল্লাহরই দাস হিসেবে বিশ্বাস করে তাই তারই নির্দেশ পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আল্লাহর নির্দেশও অনুরূপ–

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا.

Serve Allah, and join not any partners with him.

"তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর বন্দেগি করো তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না।" (সূরা আন নিসা : ৩৬)

যে কেউ আল্লাহর সাথে কোনো বিষয়কে শরীক করলো তো সে সংগে সংগে আল্লাহর কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করে নিল অর্থাৎ আল্লাহর সাথে তার আর কোন সম্পর্ক থাকে না বরং তার সাথেই তার সম্পর্ক গড়ে উঠে যাকে সে আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্ব করলো। হাদীসে কুদসীতে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً اَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِىْ فَاَنَا مِنْهُ بَرِىٌ وَهُوَ لِلَّذِىْ اَشْرَكَ.

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা

www.amarboi.org

বলেন : আমি মুশরিকদের শিরক থেকে মুক্ত-পবিত্র (আমার কোনো শরীক নেই), যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করলো, যাতে আমার সাথে আর কাউকেও শরীক করা হয়েছে। আমি তার সাথে সম্পর্কহীন, তার সম্পর্ক তার সাথে, যাকে সে শরীক করেছে।" (মুসলিম)

আগুন যেমন লাকড়িকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় তেমনি শিরক মানুষের পুণ্য কাজকে জ্বালিয়ে দেয়। এই শিরকের বিভিন্ন শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে যা না জানার কারণেও আমাদের সমাজে প্রতিনিয়ত শিরক সংঘটিত হয়ে থাকে। শিরকের বিভিন্ন শ্রেণীকে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

শিরক প্রথমত চার প্রকার। যথা :

১. اَلشِّرْكُ فِى الذَّاتِ (আল্লাহর সত্তার ক্ষেত্রে শিরক) :

আল্লাহ ব্যতীত আরো ইলাহ, রব আছে বলে বিশ্বাস করা, আল্লাহর সন্তান, বিবি আছে বলে আকীদা পোষণ করা, আল্লাহর সত্তার ক্ষেত্রে শিরক করার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. اَللهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ. وَلَمْ يَكُن لَّه كُفُوًا أَحَدٌ.

Say : He is Allah the one, Allah, the Eternal, Absolute. He begetteth not, nor is He begotten. And there is none like unto Him.

"বল, তিনি আল্লাহ এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকে জন্ম দেয়া হয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।" (সূরা আল ইখলাছ : ১-৪)

২. اَلشِّرْكُ فِى الرُّبُوْبِيَّةِ (আল্লাহর কর্তৃত্বে শিরক) :

সৃষ্টি করা, রিযক দেয়া, জীবন মৃত্যু দেয়া, রোগ মুক্ত করা, মান সম্মান দেয়া, বিপদ থেকে উদ্ধার করা, আইন দেয়া, আসমান যমীন পরিচালনা করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাউকে সম্পৃক্ত মনে করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ.

Say : Do ye see what it is ye invoke besides Allah? Show me what it is they have created on earth, or have they a share in the heavens?

www.amarboi.org

"বল তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে অথবা আসমানসমূহে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? (সূরা আল আহকাফ : ৪)

৩. اَلشِّرْكُ فِى الْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ (ইবাদতে আল্লাহর সাথে শিরক) :

আল্লাহ তায়ালার নাম হলো দু'প্রকার। সত্তাগত ও গুণবাচক নাম। সত্তাগত নাম হল আল্লাহ (اَللّٰه) কোন মাখলুকের নাম আল্লাহ রাখা হলে তা হবে সত্তাগত নামে শিরক। এমনিভাবে আল্লাহর নামে মূর্তির নাম রাখা, (যেমন : ইলাহ থেকে লাত, আযীয থেকে উযযা, মান্নান থেকে মানাত ইত্যাদি নামকরণ করা আল্লাহর গুণবাচক নামের সাথে শিরক করার অন্তর্ভুক্ত।

৪. اَلشِّرْكُ فِى الْاُلُوْهِيَّة (ইবাদতে আল্লাহর সাথে শিরক)

আইয়ামে জাহেলিয়াতে এ শিরকই বেশী প্রচলিত ছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন মূলতঃ তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ এর প্রতি দাওয়াত দেয়া এবং শিরক ফিল উলুহিয়্যাহ-কে নিষেধ করার জন্য। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

For we assuredly sent amongst every people a Messenger, (will he the command), 'serve Allah. and eschew Evil'

"আল্লাহর ইবাদত করা ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি।" (সূরা আন নাহল : ৩৬)

اَلشِّرْكُ فِى الْاُلُوْهِيَّة. বা ইবাদতে আল্লাহর সাথে শিরক আবার দুই প্রকার। যেমন–

ক. اَلشِّرْكُ الْاَكْبَرُ (বড় ধরনের শিরক)

নিম্নলিখিত কাজগুলো বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত :

১. কবরকে মসজিদ অর্থাৎ সাজদার জায়গা বানানো।

২. কবরকে সামনে রেখে ইবাদত করা।

৩. কবরে বাতি জ্বালানো।

৪. কবরকে উঁচু করা, কবরের উপর গম্বুজ বানানো, কবরের উপর চাঁদর জড়ানো, কবরকে কেন্দ্র করে লোক জমানো ইত্যাদি।

www.amarboi.org

৫. কোন গাছ, পাথর, স্থান, কবর ইত্যাদি ধরনের কোন কিছুর দ্বারা বরকত নেয়া।

৬. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যে কোন জন্তু যবেহ করা।

৭. আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন দেবতা, মূর্তি, মাজার ইত্যাদির উদ্দেশ্যে কোন কিছু পেশ করা।

৮. গায়রুল্লাহর নামে মান্নত করা।

৯. বিপদ থেকে বাঁচার জন্য গায়রুল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা।

১০. বালা-মুসীবত হতে নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে বালা, তাগা, সুতা, তাবিজ ইত্যাদি ব্যবহার করা,

১১. যাদু, গণনায় বিশ্বাস করা।

১২. গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা।

১৩. কুলক্ষণে বিশ্বাস করা।

১৪. নবী-রাসূল, ওলী-আউলিয়া সর্বত্র হাজির হতে পারেন বলে বিশ্বাস করা।

খ. اَلشِّرْكُ فِى الْاَصْغَرُ (ছোট ধরনের শিরক)

নিম্নলিখিত কাজগুলো ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত :

১. লোক দেখানো কোনো কাজ করা।

২. সুখ্যাতি ও সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করা।

৩. আমলের দ্বারা দুনিয়া লাভ করা উদ্দেশ্য হওয়া।

৪. কোন কথায় আল্লাহর ইচ্ছার সাথে অন্যের ইচ্ছাকে শরীক করা।

৫. 'যদি' শব্দ ব্যবহার করে কথা বলা। যেমন কেউ বললো- যদি অমুক না থাকত তাহলে অমুক আমাকে মেরে ফেলত।

মুমিন আল্লাহর যমীনে নম্রভাবে চলে

একজন সত্যিকার মুমিন কখনো অহংকারের সাথে বুক ফুলিয়ে চলে না। স্বৈরাচারী ও বিপর্যয়কারীর ন্যায় চলে না। বরং মুমিনের চালচলন হবে একজন ভদ্র, মার্জিত ও সৎ স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তির মতো। তবে নম্রভাবে চলার মানে দুর্বল ও রোগীর মতো চলা নয় এবং নিজের আল্লাহভীতি দেখাবার জন্য যে ধরনের

www.amarboi.org

কৃত্রিম চলার ভংগী সৃষ্টি করে সে ধরনের কোন চলাও নয়। হযরত ওমর (রা.) এক যুবককে দুর্বলভাবে হেঁটে যেতে দেখে থামিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি অসুস্থ? সে বললো 'না' হযরত ওমর (রা.) ছড়ি উঠিয়ে তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'শক্ত হয়ে সবল ব্যক্তির মতো চলো! বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মুমিন বান্দাগণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে সে পৃথিবীতে সর্বোচ্চ নম্রতা ও ভদ্রতা বজায় রেখে চলা ফেরা করবে। আল্লাহ বলেন-

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا.

And the servants of (Allah) Most Gracious are those who walk on the earth in humility.

"রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলে।" (সূরা আল ফুরকান : ৬৩)

অন্যত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا.

Nor walk on the earth with insolence for thou canst not rend the earth asunder, nor reach the mountains in height.

"যমীনে দম্ভভাবে চলো না। তুমি না যমীনকে চিরে ফেলতে পারবে, না পাহাড়ের উচ্চতায় পৌঁছে যেতে পারবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৭)

কোরআন আরো বলছে–

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ.

And be moderate in thy pace and lowerthy voice.

"নিজের চলনে ভারসাম্য আনো এবং নিজের আওয়াজ নীচু করো।" (সূরা লোকমান : ১৯)

কিন্তু চিন্তার বিষয় হচ্ছে, মানুষের চলার মধ্যে এমনকি গুরুত্ব আছে যে কারণে আল্লাহর মুমিন বান্দাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ প্রসঙ্গে চলার বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে? এ প্রশ্নটিকে যদি একটু গভীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে বুঝা যায় যে, মানুষের চলা শুধুমাত্র তার হাঁটার একটি ভঙ্গির নাম নয় বরং আসলে এটি হয় তার মন-মানস, চরিত্র ও নৈতিক কার্যাবলীর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন। একজন আত্মমর্যাদাবান সম্পন্ন ব্যক্তির চলা, একজন সভ্য-ভব্য ব্যক্তির চলা, একজন দরিদ্র দ্বীন হীনের চলা, একজন খোদাভীরু ব্যক্তির চলা আর একজন গুণ্ডা ও

www.amarboi.org

বদমায়েশের চলা, একজন স্বৈরাচারী ও যালেমের চলা, একজন অহংকারীর চলা এবং এভাবে অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের লোকদের চলা পরপর থেকে এত বেশী বিভিন্ন হয় যে, তাদের প্রত্যেকেই দেখে কোন ধরনের চলার পেছনে কোন ধরনের ব্যক্তিত্ব কাজ করছে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

"রাসূল (স.) এর চলা ফেরায় গাম্ভীর্য, আত্মসম্মানবোধ, ভদ্রতা ও দায়িত্ববোধ প্রতিফলিত হতো। দৃঢ়ভাবে পা ফেলে চলতেন। অলসভাবে পা ঘসে ঘসে চলতেন না। চলার সময় দেহ থাকতো গুটানো। প্রয়োজন নাহলে ডানে বামে না তাকিয়ে পথ চলতেন। সামনের দিকে সতেজ পা তুলতেন। চলার সময় শরীর কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতো। মনে হতো যেন ওপর হতে নিচে নামছেন। হিন্দ বিন আবি হানার ভাষায়, তাঁর চলা দেখে মনে হতো পৃথিবী তাঁর চলার সাথে সাথে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। কখনো দ্রুত চললে পা দূরে দূরে রাখতেন। তবে সাধারণত মধ্যম গতিতে চলতেন। কিন্তু হযরত আবু হুরায়রার ভাষায়, আমাদের পক্ষে তাঁর সাথে চলাই কষ্টকর হতো। তাঁর চলার ধরন ছিল সূরা লুকমানের 'যমীনের ওপর দিয়ে দম্ভভরে চলোনা' এই নির্দেশটির বাস্তব প্রতিফলন।" (মানবতার বন্ধু মুহম্মদ রাসূলুল্লাহ (স.) পৃষ্ঠা : ৭৯)

আমরা জানি, বড়াই করার অহমিকা যদি মানব দেহে থেকে থাকে তাহলে অনিবার্যভাবে তা একটি বিশেষ ধরনের চাল-চলনের মাধ্যমে বের হয়ে আসে। ব্যক্তির চাল-চলনের রং ঢং তার অহংকারের স্বরূপটি তুলে ধরে। ধন দৌলত, ক্ষমতা কর্তৃত্ব, সৌন্দর্য, জ্ঞান, শক্তি এবং তদনুরূপ অন্যান্য যতো জিনিসই মানুষের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করে তার প্রত্যেকটির বাস্তব রূপ ব্যক্তির চাল চলনে ফুটিয়ে উঠে, পক্ষান্তরে চাল চলনে দীনতার প্রকাশ ও কোনো না কোনো দূষণীয় মানসিক অবস্থার প্রভাবজাত হয়ে থাকে। এজন্যই হযরত লুকমান (আ.) তাঁর প্রিয় সন্তানকে উপদেশ দিচ্ছেন- وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ

(নিজের চলনে ভারসাম্য আনো) অর্থাৎ, নিজের মনের এসব অবস্থার পরিবর্তন করো এবং একজন সোজা-সরল ও যুক্তিসঙ্গত ভদ্র লোকের মতো চলো, যেখানে নেই কোনো অহংকার ও দম্ভ এবং কোনো দুর্বলতা, লোক দেখানো বিনয় ও ত্যাগ এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তায়ালা আজমায়ীনদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল তা হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত ঘটনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। হযরত আয়েশা (রা.) পথ চলা অবস্থায় দেখলেন একজন লোক কুঁকড়ে মুকড়ে রোগীর মতো চলছে। জিজ্ঞেস করলেন : কি হয়েছে লোকটির বলা হলো– ইনি একজন কারী (অর্থাৎ কুরআন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন এবং শিক্ষাদান ও

www.amarboi.org

ইবাদাত করার মধ্যে মশগুল থাকেন) এ কথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, 'ওমর ছিলেন কারীদের নেতা কিন্তু তাঁর অবস্থা ছিল, পথ চলার সময় জোরে জোরে হাঁটতেন। যখন কথা বলতেন, জোরে জোরে বলতেন, যখন মারধর করতেন খুব জোরে শোরেই মারধর করতেন।" (তাফহীমুল কোরআন)

মুমিনের আচরণ মূখর্তার জবাবে হয় শান্তিপূর্ণ

মূর্খ বলতে অশিক্ষিত বা লেখা পড়া জানেনা, অক্ষর জ্ঞান নেই এমন লোককে বুঝানো হয়নি। বরং মূর্খ বলতে এমন লোককেই বুঝানো হয়ে থাকে যাদের মধ্যে দ্বীনদারিতার কোনো জ্ঞান নেই, যারা ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যারা জাহেলি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবার উদ্যোগ নিয়েছে এবং কোন সভ্য-ভদ্র ও দ্বীনদারি লোকের সাথে অশালীন ব্যবহার করে। মুমিন বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হবে তারা এসব মূর্খ লোকদের গালি বা অশালীন ব্যবহারের জবাবে গালি বা অশালীন ব্যবহার এবং দোষারোপের জবাবে দোষারোপ করবে না। বেহুদাপনার জবাবে বেহুদাপনা করবে না। বরং যারাই তাঁদের সাথে এহেন আচরণ করে তাদের সালাম দিয়ে মুমিন সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিষয়টি সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করে দিয়েছেন–

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِيْنَ.

And when they hear vain talk, they turn away therefrom and say to us our deeds, and to you yours peace be to you: we seek not the ignorant.

"আর যখন তারা কোনো বেহুদা কথা শোনে, তা উপেক্ষা করে যায় এবং বলে, আরে ভাই : আমাদের কাজের ফল আমরা পাবো আর তোমাদের কাজের ফল তোমরা পাবে। সালাম তোমাদের আমরা জাহেলদের সাথে কথা বলি না।" (সূরা আল কাসাস : ৫৫)

হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রা.) এর নেতৃত্বে মুসলমানরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করলেন এরপর যখন নবী (স.) এর নবুয়াত প্রাপ্তি এবং তাঁর দাওয়াতের খবর সেই দেশে ছড়িয়ে পড়লো তখন সেখান থেকে প্রায় ২০ জনের একটি খৃষ্টান প্রতিনিধি দল প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য মক্কা মুয়াযযামায় এলো। তারা নবী

www.amarboi.org

(স.) এর সাথে মসজিদে হারামে সাক্ষাৎ করলো, কুরাইশদের বহু লোক এ ব্যাপার দেখে আশপাশে দাঁড়িয়ে গেলো। প্রতিনিধি দলের লোকেরা নবী (স.) কে কিছু প্রশ্ন করলো। তিনি সেগুলোর জবাব দিলেন, তার পর তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং কোরআনের কিছু অংশ তাদের সামনে পাঠ করে শুনালেন, কুরআন শুনে তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। তারা একে আল্লাহর বাণী বলে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করলো এবং নবীজির প্রতি ঈমান আনলো। মজলিস শেষে আবু জেহেল ও তার কয়েকজন সঙ্গী-সাথী প্রতিনিধি দলের লোকদেরকে পথে ধরলো এবং তাঁদেরকে যা ইচ্ছা তাই বলে তিরস্কার করলো।

এরপর তারা প্রতিনিধি দলকে বললো : তোমাদের সময়টাতো বৃথা হইলো। তোমাদের স্বধর্মীয়রা তোমাদেরকে এজন্য পাঠিয়ে ছিলো যে, এ ব্যক্তির (নবীজির স.) অবস্থা সম্পর্কে তোমরা যথাযথ অনুসন্ধান চালিয়ে প্রকৃত ও যথার্থ ঘটনা তাদেরকে জানাবে। কিন্তু তোমরা সবেমাত্র তাঁর কাছে বসেছিলে আর এরি মধ্যেই নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে তাঁর প্রতি ঈমান আনলে? তোমাদের চেয়ে বেশী নির্বোধ কখনো আমরা দেখিনি।"

একথায় তাঁরা (মুমিনরা) জবাব দিলো : ভাইয়েরা তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা তোমাদের সাথে জাহেলি বিতর্ক করতে চাই না। আমাদের পথে আমাদের চলতে দাও এবং তোমাদের পথে তোমরা চলতে থাকো। আমরা জেনে বুঝে কল্যাণ থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করতে চাই না।" (সীরাতে ইবনে হিশাম)

একজন মুমিন সর্বদা ভালো আচরণ দিয়েই মন্দ আচরণের মোকাবেলা করে থাকে। কেননা, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ভদ্রতা ও মানবতাবোধ থাকে সে মন্দের মোকাবেলায় ভালো আচরণ দেখতে পেলে খারাপ আচরণে আর স্থির থাকতে পারে না। বরং তার অন্তরে ঘৃণা ও হিংসার পরিবর্তে ভালোবাসা ও মমতা সৃষ্টি হয়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ.

Nor can Goodness and Evil be equal. Repel with what is better then will be between whom and thee was hatred become as it were thy friend and intimate: And no one will be granted such

www.amarboi.org

goodness except those who exercise patience and self-restraint, none but persons of the greatest good fortune.

"ভালো ও মন্দ সমান নয়। ভালো দিয়েই মন্দের মোকাবেলা করো, তখন দেখবে, যে তোমার শত্রু সেও প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে। এ গুণ তাদেরই নসীব হয় যারা ধৈর্যশীল। আর এ গুণের অধিকারীগণ অত্যন্ত সৌভাগ্যবান।" (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ : ৩৪-৩৫)

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স.) এর বাণী হলো–

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَالَ يَـاابْنَ الْخَطَّابِ فَوَاللّٰهِ مَا تُعْطِيْنَا الْجَزْلَ وَلاَ تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ حَتّٰى هُمَّ اَنْ يُّوْقِعَ بِهِ فَقَالَ الْحُرُّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ انَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ لِنَبِيِّهٖ صَـلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ وَاللّٰهِ مَاجَاوَزَهَـا عُمَرُ حِيْنَ تَلاَهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উয়াইনা ইবনে হিসন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহর শপথ, আপনি আমাদের বেশী দান করেন না এবং আমাদের ব্যাপারে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করেন না। এ কথায় ওমর (রা.) ক্রোধান্বিত হলেন, এমনকি তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন, তখন (হিসন-এর ভ্রাতুষ্পুত্র) হুর ইবনে কায়েস (রা.) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী (স.) কে বলেছেন : ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন করো, ভালো কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চলো," (সূরা আল আরাফ : ১৯৯) রাবী (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন আল্লাহর শপথ! এ আয়াত শুনে ওমর (রা.) আর অগ্রসর হননি। তিনি আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ শুনা মাত্রই সর্বাধিক অনুগত হয়ে যেতেন। (বুখারী)

মুমিন রাত কাটায় আল্লাহর ইবাদতে

মুমিন বান্দাদের দিন কাটে রিযিক অন্বেষণ ও আল্লাহর পথে লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আর রাত কাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও সেজদার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদতের মধ্য দিয়ে। মুমিন বান্দাদের রাত আরাম-আয়েশ, নাচ-গানে, খেলা-

www.amarboi.org

তামাশায়, গপ-সপে এবং আড্ডাবাজী ও চুরি-চামারীতে অতিবাহিত হয় না। জাহেলিয়াতের এসব পরিচিত বদ কাজগুলোর পরিবর্তে মুমিনরা এ সমাজে এমন সব সৎকর্মসম্পাদনকারী যাদের রাত কাটে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বসে, শুয়ে দোয়া ও ইবাদতের মধ্য দিয়ে। মুমিনদের এসব বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়–

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

They forsake their beds of sleep, the while they call on their Lord, in Fear and Hope and they spend (in charity) out of the sustenance which we have bestowed on them.

"তাদের (মুমিনদের) পিঠ থাকে বিছানা থেকে আলাদা, নিজেদের রবকে ডাকে আশংকা ও আকাঙ্ক্ষা সহকারে এবং যা কিছু রিযিক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।" (সূরা আস সাজদাহ : ১৬)

মুমিনরা আরাম-আয়েশের মধ্য দিয়ে রাত কাটাবার পরিবর্তে নিজেদের রবের ইবাদত করে। তাদের অবস্থা এমন সব দুনিয়া পূজারীদের মতো নয় যাদের দিনের পরিশ্রমের কষ্ট দূর করার জন্য রাতে নাচ-গান, শরাব পান ও খেলা-তামাশার মতো আমোদ প্রমোদের প্রয়োজন হয়। এর পরিবর্তে তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, সারা দিন নিজেদের দায়িত্ব পালন করে কাজ শেষে এসে দাঁড়ায় তারা নিজেদের রবের সামনে, তাঁকে স্মরণ করে রাত কাটিয়ে দেয়। তাঁর ভয়ে কাঁপতে থাকে এবং তাঁর কাছেই নিজেদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পন্ন করে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বান্দাদের অত্যন্ত ভালোবাসেন। তিনি চান অপরাধী বান্দারা ফিরে আসুক। হাদীস শরীফে এসেছে রাসূল (স.) বলেছেন : এক মরুযাত্রী পথ চলছিল। পথ চলতে গিয়ে এক পর্যায়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পথিক বিশ্রামের প্রয়োজনবোধ করলো। বিশ্রাম নিল, বিশ্রাম থেকে উঠে দেখে তার বেঁধে রাখা উটটি নেই, যে উটটিতে ছিল তার খাদ্য-বস্ত্র পানীয় সবকিছু। রাসূল (স.) সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন এমন অবস্থায় ঐ পথিকের অবস্থা কি হবে? সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.) লোকটির তো আর হতাশার সীমা থাকবে না। কেননা তার বেচে থাকার সকল উপকরণ ঐ উটটির ওপর ছিল। রাসূল (স.) বললেন কিছুক্ষণ হতাশার সাথে চিন্তা করার পর উটটি ফিরে এলো। এমতাবস্থায় লোকটির অবস্থা কি হবে? সাহাবীগণ বললেন, এমতাবস্থায় লোকটির

www.amarboi.org

তো দিলটি ভরে যাবে। কারণ লোকটি শুধু উটটি পায়নি বরং বেঁচে থাকার সকল উপকরণও ফিরে পেলো।

রাসূল (স.) বললেন সাহাবীরা শুনো- উট হারানোর পর পুনরায় ফিরে পাওয়ার পর উটহারা ব্যক্তি যেমন খুশি হয়ে যায় তেমনিভাবে আল্লাহর কোন বান্দা যখন পথহারা হয়ে পুনরায় ফিরে আসে, উটহারা ব্যক্তির চাইতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বেশী খুশি হয়ে যান।

এ পৃথিবীর সকল মানুষ একে অন্যের সাথে বিভিন্ন ধরনের ভুল বা অপরাধ করে থাকে। যার সাথে অপরাধ করা হয় সে কখনো বলে না যে, এসো অপরাধ করেছ ক্ষমা চাও ক্ষমা করে দেব। বরং ক্ষমা চাইলেও ক্ষমা করতে চায় না, শুধু প্রতিশোধই নিতে চায়। স্বয়ং পিতা-মাতাও সন্তান ক্ষমা চাওয়া পর্যন্ত ক্ষমা করে না। মন বলে ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করে দিব। কিন্তু ডেকে ডেকে বলে না এসো ছেলে অপরাধ করেছ ক্ষমা চাও ক্ষমা করে দেব। কিন্তু একমাত্র দয়াবান প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক গভীর রাতে প্রথম আসমানে আসেন এবং ডেকে ডেকে বলেন তোমরা কে কি অপরাধ করেছ, আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি ক্ষমা করে দেব। আর এ সুযোগ প্রতিনিয়ত মুমিনগণ কাজে লাগান; হাদীসে কুদসীতে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـــ) اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلٰى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ فَيَقُوْلُ مَنْ يَّدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبُ لَهٗ مَنْ يَّسْاَلُنِىْ فَاُعْطِيَهٗ مَنْ يَّسْتَغْفِرُوْنِىْ فَاَغْفِرَ لَهٗ.

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন : আমাদের মহান বরকতময় রব প্রতিরাতে দুনিয়ার আকাশে (প্রথম আকাশে) আগমন করেন। তিনি আগমন করেন তখন যখন এক-তৃতীয়াংশ রাত বাকি থাকে তখন তিনি ডেকে বলেন : কে আছে আমার কাছে দোয়া করার, আমি তার দোয়া কবুল করবো? কে আছে আমার কাছে চাওয়ার, আমি তাকে দান করবো? কে আছে আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার আমি তাকে ক্ষমা করবো? (বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী)

মুমিন রাতের প্রথমার্ধে একটু ঘুমিয়ে পুরো দিনের ক্লান্তি দূর করে শেষ রাতে উঠে গিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যায়। রুকু করে, সেজদাহ করে, চোখের পানি

www.amarboi.org

ছেড়ে দিয়ে দয়াবান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন–

كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ــ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ــ

They were in the habit of sleeping but little by right. And in the hours of early down, they (were found) praying for forgiveness.

"রাত্র কালে তারা কমই ঘুমায় এবং অতি প্রত্যুষে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে।" (সূরা আয যারিয়াত : ১৭-১৮)

মুমিন রাতের বেশীর ভাগ সময়ই মহান আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে কাটাবে এবং অল্প সময় ঘুমাবে এবং রাতের শেষাংশে আপন প্রভুর কাছে এই বলে প্রার্থনা করে যে, হে আল্লাহ তায়ালা তোমার যতটুকু ইবাদত-বন্দেগি করা আমার কর্তব্য ছিল তা করতে আমার ত্রুটি হয়েছে। একজন মুমিন আল্লাহর দাসত্বের এরূপ পরাকাষ্ঠাই দেখাবে যে, সে আল্লাহর বন্দেগিতে জীবনাতিপাত করবে এবং তা সত্ত্বেও এজন্য কোনো রকম গর্বিত হওয়া এবং নিজের নেক কাজের জন্য অহংকার করার পরিবর্তে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি করার জন্য বিনীতভাবে প্রার্থনা করবে।

সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান শিক্ষক বিশ্বনবী (স.) রাতের প্রথমাংশে ঘুমাতেন এবং শেষাংশে ঘুম ত্যাগ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। হাদীস শরীফে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ صَلاَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ اَوَّلَهُ وَيَقُوْمُ اٰخِرَهُ فَيُصَلِّى ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى فِرَشِهِ فَاِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ فَاِنْ كَانَتْ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ وَاِلاَّ تَوَضَّأَ وَخَرَجَ.

হযরত আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স.) এর রাতের নামায কেমন ছিল? জবাবে তিনি বললেন : তিনি [রাসূল (স.)] রাতের প্রথম ভাগে ঘুমাতেন এবং শেষ ভাগে ঘুম থেকে উঠে নামায আদায় করতেন এবং তারপর আবার শুয়ে পড়তেন। পরে মুয়াযযিন যখন আযান দিতেন তখন তিনি (বিছানা ছেড়ে) দ্রুত উঠে পড়তেন এবং গোসলের প্রয়োজন থাকলে গোসল করে নিতেন, অন্যথায় শুধু অযু করে (মসজিদের দিকে) চলে যেতেন। (বুখারী)

www.amarboi.org

অর্থাৎ, শুধু সারারাত ঘুমের মধ্যে বিশ্বনবী (স.) কাটিয়ে দিতেন না। দিনের বেলায় মানুষের কল্যাণে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যস্ত থাকতেন আর রাতের বেলায় আল্লাহর সান্নিধ্যের মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধির কাজে ব্যস্ত থাকতেন। একজন মুমিন সে আল্লাহর রাসূলের সঠিক অনুসরণের মধ্য দিয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য রাত কাটিয়ে দিবে।

মুমিন সর্বদা আল্লাহর আযাব থেকে পানাহ চায়

মুমিন ব্যক্তি যতই ইবাদত করুক না কেন, যতই দান খয়রাত করুক না কেন। কোন ইবাদত বা দান খয়রাতই মুমিনের মধ্যে অহংকারের জন্ম দিতে পারে না। আমরা আল্লাহর ইবাদত করি, তাঁর পথে জিহাদ করি, যাকাত দেই, হজ করি এবং এসবের মধ্য দিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন আমরা নিশ্চিতভাবে পাবো। কাজেই জাহান্নামের আগুন আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। এ ধরনের কোন গর্ব-অহংকার মুমিনের হৃদয়ে জায়গা নিতে পারে না। বরং নামায রোযা, হজ, যাকাত, দাওয়াতী কাজ, জিহাদ, দান খয়রাতসহ নিজেদের যাবতীয় সৎকাজ ও ইবাদত-বন্দেগির পরেও তাঁরা এ ভয়ে কাঁপতে থাকবে যে, তাদের কাজের ভুল-ত্রুটিগুলো বুঝি তাদের আযাবের কারণ হবে। নিজেদের তাকওয়ার জোরে জান্নাত জয় করে নেবার অহংকার তারা করে না। বরং নিজেদের যাবতীয় মানবিক দুর্বলতাসহ সকল অপরাধগুলোকে বার বার স্মরণ করে এবং মহান দয়াবান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। পরম দয়াবান আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে তাঁর পরকালের আযাব হতে পানাহ চায় মুমিন।

মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তারা নেক আমল করা সত্ত্বেও কাফির মুনাফিকদের ন্যায় আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় হয় না। সে প্রত্যেক পদে পদে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আযাবকে ভয় করতে থাকবে এবং তা থেকে পানাহ চাইতে থাকবে। কোরআন বলছে–

وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ

And those who fear the punishment of their Lord.

"যারা তাদের প্রভুর আযাবকে ভয় করে।" (সূরা আল মা'আরিজ : ২৭)

অর্থাৎ মুমিনরা নিজস্বভাবে যথাসম্ভব নৈতিকতা ও কাজকর্মে সদাচরণ করা সত্ত্বেও সবসময় আল্লাহর আযাবের ভয়ে ভীত থাকে। তারা সবসময় ভাবতে থাকে যে, না জানি আল্লাহর আদালতে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের কাজের তুলনায় অধিক বলে প্রমাণিত হয়ে যায় এবং আমরা আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন

www.amarboi.org

হয়ে যাই, যে আযাব হবে অত্যন্ত কঠিন, দীর্ঘ ও স্থায়ী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا.

We only fear a Day of frowning and distress from the side of our Lord.

"আমরাতো আমাদের রবের পক্ষ থেকে সেদিনের আযাবের ভয়ে ভীত, যা হবে কঠিন বিপদ ভরা অতিশয় দীর্ঘদিন।" (সূরা আদদাহর : ১০)

এ পৃথিবীর অনেক মানুষ অনেক মানুষকে অনেক ধরনের শাস্তি দিয়ে থাকে। আর পৃথিবীর সর্বোচ্চ শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। যার পরে আর কোন শাস্তি দিতে পারে না, দিলেও শাস্তিপ্রাপ্ত তা উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শাস্তি হলো অত্যন্ত কঠিন যে শাস্তির আলামত পৃথিবী উপলব্ধিও করতে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ.

Truly strong is the Grip of thy Lord.

"নিশ্চয়ই তোমার রবের পাকড়াও (আযাব) বড়ই শক্ত।" (সূরা আল বুরূজ : ১২)

সেই শক্তিশালী আযাবে গুনাহগার যখন পতিত হবে তখন সে ঐ শক্তিশালী আযাবে বাঁচবেও না আবার মরবেও না অর্থাৎ পরকালীন পুরো জীবনে সেই শক্তিশালী আযাবের কাঠিন্যতায় পড়ে থাকতে হবে, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করেছেন–

اَلَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ــ ثُمَّ لاَ يَمُوْتُ فِيْهَا وَلاَ يَحْيٰى ــ

Who will enter the Great fire, in which he will then neither die nor live.

"যে বৃহৎ আগুনে প্রবেশ করবে, তারপর সেখানে মরবেও না এবং বাঁচবেও না।" (সূরা আ'লা : ১২-১৩)

হিটলার ষাট লক্ষ মানুষ হত্যা করেছিল, যার জন্য যদি তাকে শাস্তি দেয়া হতো তা হলে তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি একবার মৃত্যুদণ্ড দেয়া যেত। আর একবার মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলে একজন মানুষ হত্যার বিচার করা হতো। বাকী ৫৯,৯৯,৯৯৯ জন মানুষ হত্যার বিচার বাকি থেকেই যেত।

www.amarboi.org

সুতরাং ৬০ লক্ষ মানুষ হত্যার বিচার যেন করা যায় সে রকম একটি ব্যবস্থা তার জন্য করা উচিৎ ছিল যেন একটি হত্যার শাস্তি থেকেও সে রেহাই না পেতো, কিন্তু বাস্তবতা হলো এ ব্যবস্থা তৈরী করা পৃথিবীর কোনো আদালতের পক্ষে সম্ভব নয়। এটি সম্ভব একমাত্র মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদালতের পক্ষে। যেখানে আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই আবার বাঁচার মত বাঁচারও কোনো অবকাশ নেই। যার ফলে জীবনের কোন স্বাদ-আহ্লাদও পাবে না।

মুমিন বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক এবং তাঁর আযাবকে প্রতিরোধ করার মতো শক্তি সৃষ্টিকুলে কারো নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে সতর্কসুলভ ভাষা দিয়ে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন–

فَإِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ.

If they accuse thee of falshood. say: your Lord is full of mercy all-embracing, but from people in guilt never will His wrath be turned back.

"এখন তারা যদি তোমার কথা না মানে তাহলে তাদেরকে বলে দাও, তোমাদের রবের অনুগ্রহ সর্বব্যাপী এবং অপরাধীদের ওপর থেকে তাঁর আযাব রদ করা যেতে পারে না।" (সূরা আল আনআম : ১৪৭)

অন্যত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

قَالَ سَآوِيْ إِلٰى جَبَلٍ يَعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ إِلاَّ مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ.

The son replied: I will betake myself to some mountain: it will save me from the water. Nuah Said: this day nothing can save. From the Command of Allah, any but those on whom He hath mercy! and the waves Came between them, and the Son was among those who were drowned.

"সে (নূহ এর ছেলে) বললো, আমি এখনই একটি পাহাড়ে চড়ে বসছি। তা আমাকে পানি থেকে বাঁচাবে। নূহ বললো আজ আল্লাহর হুকুম (আযাব) থেকে বাঁচাবার কেউ নেই, তবে যার প্রতি আল্লাহ রহম করবেন সে ছাড়া। এমন সময়

www.amarboi.org

একটি তরঙ্গ উভয়ের মধ্যে আড়াল হয়ে গেলো এবং সেও নিমজ্জিতদের দলে শামিল হয়ে গেলো।" (সূরা হূদ : ৪৩)

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ইহকাল ও পরকালে গুনাহগারদের জন্য বিভিন্ন ধরনের আযাব হতে পারে। দুনিয়াতে কখনো জলোচ্ছ্বাস, কখনো ভূমিকম্প, কখনো ঘূর্ণিঝড়, কখনো ডাইরিয়া কখনো কলেরা, কখনো মহামারি আবার কখনো দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ইত্যাদি। আল্লাহর আযাবের ধরনের কোন শেষ নেই। কর্ম অনুযায়ী যখন যেখানে যে আযাব দেয়া দরকার বলে তিনি মনে করেন, তখন সেখানে সে আযাবই আল্লাহ তায়ালা দিয়ে থাকেন। সে আযাবগুলো বড় হোক অথবা ছোট হোক মুমিন তা থেকে সর্বদা আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে। আর পরকালের আযাবেরতো কথাই নেই, দুনিয়াতে আমরা যে আযাব অবলোকন করি আল্লাহর ভাষায় তা হলো পরকালের নমুনামাত্র। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

كَذَالِكَ الْعَذَابُ ط وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ج لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

Such is the Punishment (in this life), but greater is the punishment in the Hereafter, if only they knew.

"আযাব এরূপই হয়ে থাকে, আখেরাতের আযাব এর চেয়েও বড় হায় তারা যদি জানতো।" (সূরা আল কলম : ৩৩)

সুতরাং মুমিন ইহকালীন-পরকালীন, বড়-ছোট সকল ধরনের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। সে অপরাধীদের ন্যায় বুক ফুলিয়ে অহংকারে মেতে উঠবে না।

মুমিন অপচয় করে না– কৃপণও হয় না

মুমিন এমন হবে না যে, আরাম-আয়েশ, বিলাস-ব্যসন, মদ-জুয়া, মেলা-পার্বন এবং বিয়েশাদীর পিছনে অঢেল টাকা-পয়সা খরচ করবে এবং নিজের স্বার্থের চেয়ে অনেক বেশী নিজকে দেখাবার জন্য খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়ী-গাড়ী, সাজ-গোছ ইত্যাদির পিছনে অঢেল টাকা-পয়সা ছড়িয়ে দিবে। মুমিন আবার এমনও হবে না যে, অর্থলোভীর মতো একটা পয়সা গুনে গুনে রেখে কৃপণতার চরম শিহরে আরোহণ করবে। নিজে খাবে না, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন মেটাবেনা, এ ধরনের লোক আরবে আল্লাহর রাসূলের সময় বিপুল সংখ্যক পাওয়া যেতো।

www.amarboi.org

এ প্রসঙ্গে অমিতব্যয়িতা ও কার্পণ্য কি জিনিস তা স্পষ্ট হওয়া উচিত। ইসলামের দৃষ্টিতে তিনটি জিনিসকে অমিতব্যয়িতা বলা হয় এক. অবৈধ কাজে অর্থ ব্যয় করা, তা একটি পয়সা হলেও। দুই. বৈধ কাজে ব্যয় করতে গিয়ে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে সে নিজের সামর্থ্যের চাইতে বেশী ব্যয় করে অথবা নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী যে অর্থ সম্পদ সে লাভ করেছে তা নিজেরই বিলাস-ব্যসনে ও বাহ্যিক আড়ম্বর অনুষ্ঠানে ব্যয় করতে পারে। তিন. সৎকাজে ব্যয় করা, কিন্তু আল্লাহর জন্য নয় বরং অন্য মানুষকে দেখাবার জন্য। পক্ষান্তরে কার্পণ্য বলে বিবেচিত হয় দু'টি জিনিস। যেমন- এক. মানুষ নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনদের প্রয়োজন পূরণের জন্য নিজের সামর্থ্য ও মর্যাদা অনুযায়ী ব্যয় করে না। দুই. ভালো ও সৎকাজে তার পকেট থেকে পয়সা বের হয় না। এ দু'টি প্রান্তিকতার মাঝে ইসলামই হচ্ছে ভারসাম্যের পথ।

গর্ব, অহংকার ও ভোগবিলাসে অর্থ সম্পদ ব্যয় করা আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতারই নামান্তর। আর এ-অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই শয়তানের ভাই। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল ইরশাদ করেন–

وَآتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا.

And render to the kindred their due rights, as to those in want and to the way farer. but Squander not in the manner of a spendthrift. verilly spendthrifts are brothers of the satans and the satan is to his Lard (Himself) ungrateful.

"আত্মীয়কে তার অধিকার দাও এবং মিসকিন ও মুসাফিরকেও তাদের অধিকার দাও। অপব্যয় করো না। যারা ধন-সম্পদ অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৬-২৭)

সম্পদ ব্যয়ে যদি মানুষ ভারসাম্য রক্ষা না করে তাহলে মানুষ হয় অপমানিত হয়ে যায় অথবা নিঃস্ব হয়ে যায়। অহংকার ও প্রদর্শনেচ্ছামূলক এবং লোক দেখানো খরচ, বিলাসিতা, বাজে ও অশ্লীল কাজে ব্যয় এবং এমন যাবতীয় ব্যয় যা মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনে ও কল্যাণমূলক কাজে লাগার পরিবর্তে ধন-সম্পদ ভুল পথে নিয়োজিত করে, তা আসলে আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার ছাড়া আর কিছুই নয়।

www.amarboi.org

মানুষের মধ্যে এতটুকু ভারসাম্য হতে হবে যাতে তারা কৃপণ হয়ে অর্থের আবর্তন রুখে না দেয় এবং অপব্যয়ী হয়ে নিজের অর্থনৈতিক শক্তি ধ্বংস না করে। আল্লাহ বলেন–

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً إِلىٰ عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا.

Make not thy hand tied (like a niggard's) to thy neck, nor stretch it forth to its utmost reach, So that thou becom blame worthy and destitute.

"নিজের হাত গলায় বেঁধে রেখো না (কৃপণতা করোনা) এবং তাকে একেবারে খোলাও ছেড়ে দিওনা (অপচয় করোনা), তাহলে তুমি নিন্দিত ও অক্ষম হয়ে যাবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৯)

কৃপণতা এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা মানুষের মধ্যে প্রবেশ করলে ইহকালীন জীবনে হতে হয় অপমানিত এবং পরকালীন জীবনে পতিত হতে হয় এক কঠিনতম ও যন্ত্রণাদায়ক স্থানে। কালামে হাকীমে বর্ণিত হয়েছে–

اَلَّذِيْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهُ ــ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ــ كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ.

Who piluth up wealth and layxeth it by, thingking that his wealth would make him last for ever. By no means! He will be sure to be thrown into that which Breaks to pieces.

"যে অর্থ : সম্পদ জমা করে এবং তা গুনে গুনে হিসাব রাখে, মনে করে তার এ অর্থ-সম্পদ চিরদিন তারই থাকবে। কখনো নয়, তাকে তো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী জায়গায় ফেলে দেয়া হবে।" (সূরা আল হুমাযাহ : ২-৪)

এ ব্যাপারে রাসূল (স.) এর হাদীস হলো–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّخِىُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللهِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ ــ وَالْجَاهِلُ سَخِىٌّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ.

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (স.) বলেছেন, দাতা

www.amarboi.org

ব্যক্তি আল্লাহর যেমন নিকটবর্তী, তেমনি নিকটবর্তী মানুষেরও। আবার বেহেশতের যেমন নিকটবর্তী, তেমনি জাহান্নাম থেকে বেশ দূরে। আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে যেমন দূরে, তেমনি দূরে মানুষের কাছ থেকে ও বেহেশত থেকে, অপরদিকে সে জাহান্নামের খুব নিকটবর্তী। আর একজন অশিক্ষিত দাতা ব্যক্তি একজন কৃপণ আবেদের চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়।" (তিরমিযী)

রাসূলে আকরাম (স.) আরো ইরশাদ করেছেন–

عَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَّلاَ بَخِيْلٌ وَّلاَ مَنَّانٌ.

হযরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক (স.) বলেছেন, "প্রতারক কৃপণ ও খোটাদানকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।" (তিরমিযী)

সুতরাং একজন মুমিন যখন ব্যয় করে তখন তার মধ্যে সর্বোচ্চ ভারসাম্য পরিলক্ষিত হবে, না সে অযথা ব্যয় করবে আবার না সে শুধু গুনে গুনে জমা করবে। প্রয়োজনের আলোকে খরচ করবে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন–

وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا.

Those who, when they spend are not extravagant and not niggarrdly, but hold a just (balance) belween those (extremes).

"তারা (মুমিনরা) যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না এবং উভয় প্রান্তিকের মাঝামাঝি তাদের ব্যয় ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।" (সূরা আল ফুরকান : ৬৭)

মুমিন অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না

আরবের বুকে অন্ধকার ছেদে আলোর প্রদীপ বিশ্বনবী (স.) যখন আগমন করেন তখন আরব সমাজে সবচেয়ে বড় তিনটি গুনাহের প্রচলন ছিল, যেমন– ১. শিরক, ২. অন্যায়ভাবে হত্যা করা, ৩. যিনা করা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, একবার নবী (স.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল : সবচেয়ে বড় গুনাহ কি? তিনি (স.) বললেন : তুমি যদি কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে কর। অথচ আল্লাহই তোমাকে সৃষ্টি

www.amarboi.org

করেছেন। এরপর জিজ্ঞেস করা হলো : তারপর কি? তিনি (স.) বললেন : তুমি যদি তোমার সন্তানকে হত্যা কর এই ভয়ে যে, সে তোমার সাথে আহারে অংশ নিবে।" আবার জিজ্ঞেস করা হলো : 'তারপর কি? তিনি (স.) বললেন : তুমি যদি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা কর।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আহমদ)

তৎকালীন আরব ভূখণ্ডে মানুষ হত্যা ছিল একটি প্রতিযোগিতামূলক খেলার ন্যায়। জীবনের কোন মূল্য ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই একে অন্যকে হত্যা করে ফেলতো। আবার একটি হত্যাকাণ্ডের জন্য দেখা যেত যুগের পর যুগ যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকতো। এক্ষেত্রে তারা কোন কিছুরই তোয়াক্কা করত না। এমনকি যার সামনে তারা মাথা নত করত, যার পূজা করতো তাকেও মূল্যায়ন বা সম্মান করার মতো তাদের মানসিক শক্তি ছিল না। 'জোর যার মুল্লুক তার (might is right) নীতির অনুসরণ করত তারা। একজন আরব নিজের পিতার হত্যাকারী থেকে প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছিল। 'যুলখালাসাহ' নামক ঠাকুরের আস্তানায় গিয়ে সে ধরনা দেয় এবং এ ব্যাপারে তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা জানতে চায়। সেখান থেকে এ ধরনের কাজ না করার জবাব আসে। উক্ত জবাবে আরবটি ক্রোধান্বিত হয়ে বলতে থাকে–

لَوْ كُنْتَ يَاذُ الْخَلَصَ الْمَوْتُوْرَ. مِثْلِيْ كَانَ شَيْخُكَ الْمَقْبُوْرَ لَمْ تَنْهُ عَنْ قَتْلِ الْعَدَاةَ زُوْرًا.

"হে যুলখালাসা! তুমি যদি আমার জায়গায়
নিহত হত যদি তোমার পিতা
তাহলে তুমি কখনো মিথ্যাচারী হতে না।
বলতে না, প্রতিশোধ নিয়োনা যালেমদের থেকে।"

হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর বুকে এমন একটি কর্ম যা কখনো কোন প্রকার সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। কারণ হল লাল রং দিয়ে কখনো লাল রংকে ঢাকা যায় না। হত্যা শুধু মানব সমাজে বিপর্যয়ই ডেকে আনতে পারে। যে বিপর্যয়টিকে দূর করতে গেলে আরো অনেকগুলো হত্যাকাণ্ড সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। সেই জন্য ইসলাম এই রূপ একটি বিপর্যয়কে সারা পৃথিবীর জন্য বিপর্যয় বলে চিহ্নিত করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন–

www.amarboi.org

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَالِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ.

On that account : we ordained for the Children of isreal that if any one slew a person-unless it be for murder or for speading mischief in the land-it would be as if he slew the whole people: and if any one saved a life. It would be as if he saved the life of the whole people. Then although there came to them our Messengers with Clear signs, yet, even after that, many of them continued to commit excenes in the land.

"এ কারণেই বনী ইসরাঈলের জন্য আমি এ ফরমান লিখে দিয়েছিলাম, নর হত্যা অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন কারণে যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলো সে যেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হত্যা করলো।

আর যে ব্যক্তি কারো জীবন রক্ষা করলো সে যেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জীবন রক্ষা করলো। কিন্তু তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমার রাসূলগণ একের পর এক সুস্পষ্ট হেদায়াত নিয়ে এলো তাদের কাছে, তারপরও তাদের বিপুল সংখ্যক লোক পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘনকারীই থেকে গেলো।" (সূরা আল মায়েদা : ৩২)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে সে কেবলমাত্র ঐ এক ব্যক্তির ওপর যুলুম করে না বরং সে একথাও প্রমাণ করে যে, তার অন্তরে মানুষের জীবনের প্রতি মর্যাদাবোধ ও সহানুভূতির কোন স্থান নেই। কাজেই সে সমগ্র মানবতার শত্রু। কারণ তার মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব বিরাজমান যা প্রতিটি মানুষের মধ্যে পাওয়া গেলে সারা দুনিয়া থেকে মানব জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষের জীবন রক্ষায় সাহায্য করে সে আসলে মানবতার সাহায্যকারী ও সমর্থক, তার মধ্যে এমন গুণ বিরাজমান, যার ওপর মানবতার অস্তিত্ব বিদ্যমান। কারণ হলো তার মধ্যে বিরাজমান গুণটি যদি প্রতিটি মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে পৃথিবীর বুকে অন্যায়ভাবে কোন

www.amarboi.org

হত্যাকাণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তবে ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হত্যা করা যাবে এমন পাঁচটি বৈধ কারণ রয়েছে। যেমন পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.

Say : come, I will rehearse what Allah hath (really) prohibited you from: join not anything with Him. Be good to your parents, kill not your children on a plea of want, we provide sustenance for you and for them, come not nigh to indecent deeds, whether open or secret, take not life, which allah hath made sacred except by way of justice and law: thus doth He command you, that ye may learn wisdom.

"(হে মুহাম্মদ) বলে দাও, এসো আমি তোমাদের শুনাই তোমাদের রব তোমাদের ওপর কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন,

১. তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না।

২. পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।

৩. দারিদ্র্যের ভয়ে নিজের সন্তানদেরকে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে জীবিকা দিচ্ছি এবং তাদেরকেও দেব।

৪. প্রকাশ্যে বা গোপনে অশ্লীল বিষয়ের (যিনার) ধারে কাছেও যেও না।

৫. আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন ন্যায়সঙ্গতভাবে ছাড়া তাকে ধ্বংস করো না।

তিনি (আল্লাহ) তোমাদের এ বিষয়গুলো নির্দেশ দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা ভেবে চিন্তে কাজ করবে।" (সূরা আল আনআম : ১৫১)

www.amarboi.org

উপরিউক্ত পাঁচটি বিষয় বা আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন করবে যারা তাদেরকে হত্যা করা যেতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান এটা বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু এর বাইরে (ন্যায়সঙ্গত ছাড়া) কোন মানুষকে হত্যা করা যাবে না। তাই একজন আল্লাহর প্রিয় মুমিন বান্দা ন্যায়সঙ্গত ছাড়া কোন হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ.

Nor slay such life as Allah has made sacred, except for just cause.

"আল্লাহ যে প্রাণকে হারাম করেছেন কোন সংগত কারণ ছাড়া (রহমানের বান্দারা মুমিনরা) তাকে হত্যা করে না।" (সূরা আল ফুরকান : ৬৮)

মুমিন মিথ্যাবাদী বা মিথ্যা সাক্ষী হবে না

সচ্চরিত্রের পরিপন্থী সেই সব আচার-আচরণকে দুশ্চরিত্র বলা হয়, মানুষের সুস্থ বিবেক বুদ্ধি যাকে সর্বদা এড়িয়ে চলে। এসব দুশ্চরিত্র যখন কোন ব্যক্তি বা সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করে তখন তাকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের হাত থেকে আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তি আর রক্ষা করতে পারে না। সেই সব দুশ্চরিত্রের কোন ছায়াও যেন ব্যক্তি বা সমাজে বিস্তার লাভ করতে না পারে। সে ব্যাপারে কোরআন ও হাদীস জোর তাগিদ দিয়েছে। আর সেই সব দুশ্চরিত্রের মধ্যে অন্যতম হলো মিথ্যাবাদী হওয়া। যার জন্যই কোরআন বলেছে–

وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ.

And Shun the word that is false.

"মিথ্যা কথা থেকে দূরে থাকো।" (সূরা আল হজ্জ : ৩০)

কথা ও কাজের যত খারাপ শাখা বা দিক রয়েছে, তার মধ্যে মিথ্যা হচ্ছে তার লিডার বা প্রধান। মিথ্যে থেকে যে নিজকে দূরে রাখতে পারে না অথবা মিথ্যেকে যে পরিহার করতে পারে না, তাকে দিয়ে ভালো ও কল্যাণকর কোনো কাজের আশাই করা যায় না এবং সে নিজেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের লানত প্রাপ্ত হয়ে থাকে, পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে–

أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ.

www.amarboi.org

That he solemnly invokes the curse of Allah on himself if he tells a lie.

"তার ওপর আল্লাহর লানত হোক, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়!" (সূরা আন নূর : ৭)

এখানে মিথ্যাবাদীর ওপর লানত মানে হল সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে এবং আল্লাহর আক্রোশ ও গযবে পতিত হবে। পবিত্র কোরআনুল কারীমে কুফর ও যুলুমের পর কেবল মিথ্যের জন্য এ ভয়ানক শাস্তির কথা বলা হয়েছে। আর যারা মিথ্যেবাদী তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা মুনাফিক বলে চিহ্নিত করেছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সাক্ষ্য দিচ্ছেন–

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ.

And Allah beareth witnesss that the Hypocrites are indeed liars.

"অল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন অবশ্যই মুনাফিকরা চরম মিথ্যেবাদী।' (সূরা আল মুনাফিকূন : ১)

সত্যের মধ্যে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলমীন এমন উত্তম প্রভাব রেখেছেন, যে প্রভাব সত্যবাদী লোককে নেক কাজের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকে। ফলে সত্যবাদী লোক নেককার লোকে পরিণত হয়ে যায়, আর নেককার লোকেরাই জান্নাতের অধিকারী হয়ে থাকে। বিপরীত দিকে মিথ্যের এমন খারাপ প্রভাব মিথ্যেবাদী লোকের দিলে পড়ে, যার ফলে সে খারাপ কাজ করতে থাকে। আর পাপী ব্যক্তিরাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। সহীহ হাদীস গ্রন্থে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে–

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا وَاِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا. (بخارى ومسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন, "সত্যবাদিতা লোকদেরকে নেক কাজের দিকে নিয়ে যায়, আর নেক কাজ লোকদেরকে বেহেশতের দিকে নিয়ে যায়। একটি লোক নিয়তই যখন সত্য কথা বলতে থাকে, তখন আল্লাহর দরবারে তার নাম সত্যবাদী হিসেবে লিখিত হয়ে

www.amarboi.org

যায়। আর মিথ্যা লোকদেরকে খারাপ কাজের দিকে নিয়ে যায়, আর খারাপ কাজ লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। একটি লোক যখন নিয়তই মিথ্যে বলতে থাকে, তখন আল্লাহর দরবারে তার নাম মিথ্যেবাদী হিসেবে লিখিত হয়ে যায়।" (বুখারী ও মুসলিম)

ভীরুতা ও কৃপণতা অবশ্যই কুস্বভাবের অন্তর্ভুক্ত, কোন সন্দেহ নেই। একজন দুর্বল ঈমানদারের মধ্যে এ দু'টি বা দু'টির যে কোন একটি থাকতেই পারে। আর দু'টি স্বভাব খারাপ হলেও কিন্তু ঈমানের পরিপন্থী নয়। তবে মিথ্যে স্বভাবটি এমন একটি ঘৃণিত স্বভাব যা সম্পূর্ণ ঈমানের বাস্তব পরিপন্থী। সুতরাং একজন প্রকৃত মুমিন কোন অবস্থাতেই মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে না। হাদীস শরীফে এসেছে–

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا قَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهُ اَيَكُوْنُ بَخِيْلاً قَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهُ اَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ كَذَّبًا قَالَ لاَ.

হযরত সাফওয়ান বিন সুলাইম (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করা হলো : মুমিন ব্যক্তি কি ভীরু হতে পারে? রাসূল (স.) বললেন : হ্যাঁ (মুমিন ব্যক্তি ভীরু হতে পারে) আবার জিজ্ঞেস করা হলো : মুমিন ব্যক্তি কি কৃপণ হতে পারে? রাসূল (স.) বললেন : হ্যাঁ (দুর্বল মুমিন ব্যক্তি কৃপণ হতে পারে) অতঃপর জিজ্ঞেস করা হলো : মুমিন ব্যক্তি কি মিথ্যাবাদী হতে পারে? রাসূল (স.) বললেন : না (মুমিন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হতে পারে না)। (মুয়াত্তা, বায়হাকী)

স্বাভাবিকভাবে মিথ্যে বলা, মিথ্যে সাক্ষী দেয়া বা মিথ্যের পক্ষ নেয়া হারাম। তবে মহৎ উদ্দেশ্যে যদি কখনো মিথ্যে বলতে হয়, তাহলে মহৎ উদ্দেশ্যের কারণে ঐ মিথ্যে বৈধ হয়ে যায়। যেমন ধরা যাক, কোন ঘাতক কাউকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কারও কাছে তার ঠিকানা বা অবস্থান সম্পর্কে জানতে চায়, আর এমতাবস্থায় সে যদি মিথ্যে বলে হত্যার হাত থেকে এ লোকটিকে বাঁচাতে পারে, তাহলে তার এ মিথ্যে বলা শুধু জায়েযই নয় বরং ওয়াজিব। পরস্পর দু'জনের মধ্যে ঝগড়া মিটাবার উদ্দেশ্যে কোন অসত্য কথা বলতে চাইলে তাও জায়েয হওয়ার ফতোয়া ওলামায়ে কেরামগণ দিয়েছেন, হাদীস শরীফে এসেছে–

عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِىْ خَيْرًا اَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا.

www.amarboi.org

হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল (স.) কে একথা বলতে শুনেছেন : "পরস্পর দু'জনের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করার জন্য যে অসত্য কথা বলে সে প্রকৃতপক্ষে মিথ্যেবাদী নয়, কেননা সে কল্যাণার্থে অথবা কল্যাণ সাধনের জন্য চেষ্টা করছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মিথ্যা কথা বলা কবিরা গুনাহ। তবে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়া মিথ্যা কথার চেয়েও ভয়াবহ। কেননা মিথ্যা সাক্ষ্যের ফলাফল এমন যে, আকাশকে যমীন বানিয়ে দেয় এবং যমীনকে সাগর বানিয়ে দেয় অর্থাৎ মিথ্যে সাক্ষ্য খুনিকে মুক্তি দিয়ে দেয় আর বাদীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয় এজন্যই হুজুরে আকরাম (স.) খুব গুরুত্বের সাথে মিথ্যা সাক্ষীদানের ব্যাপারে কথা বলেছেন। যা সহীহ হাদীস গ্রন্থে এসেছে–

وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ (صـ) ثَلاَثًا اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ اَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ اَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ يَقُوْلُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْلَتَهُ يَسْكُتُ. (بخارى ومسلم)

হযরত আবু বকর (রা.) তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, একদা রাসূল (স.) বলেছেন : আমি কি তোমাদের গুনাহসমূহের মধ্য থেকে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে বলব না? আমরা বললাম হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.) আপনি অবশ্যই আমাদের তা বলবেন, হুজুর (স.) বললেন : তা হলো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। এ পর্যন্ত হুযুর (স.) হেলান দেয়া অবস্থায় বসা ছিলেন। হঠাৎ তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন : সাবধান! আর হল মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া– এভাবে বার বার এই বাক্যটি বলতে থাকলেন তিনি। এমনকি আমরা মনে মনে বলতে থাকলাম, আহ! হুজুর (স.) যদি কথা বন্ধ করতেন। (বুখারী, মুসলিম)

মুমিনরা হবে পরস্পর ভাই ভাই

মুসলিম বিশ্বে ভ্রাতৃত্বের যে বন্ধন পৃথিবীর অন্য কোন আদর্শ বা মত ও পথের অনুসারীদের মধ্যে অনুরূপ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন পাওয়া যায় না। পৃথিবীর যে কোন

www.amarboi.org

অঞ্চলের মুসলিম ভাইয়েরা ব্যথা পেলে অন্য অঞ্চলের মুসলিম ভাইয়েরা সেই ব্যথায় ব্যথিত হয়, কোন প্রকার কষ্টের স্বীকার হলে সে কষ্টে কষ্টিত হয়। তবে এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হলে শর্ত হলো ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রকৃত মুমিন হতে হবে। হাদীস শরীফে এসেছে–

হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেছেন :

"একজন মুমিনের সাথে আরেকজন মুমিনের সম্পর্ক ঠিক তেমন– যেমন দেহের সাথে মাথার সম্পর্ক। সে মুমিনের প্রতিটি দুঃখ কষ্ট ঠিক তেমন অনুভব করে যেমন মাথা দেহের প্রতিটি অংশের ব্যথা অনুভব করে।" (মুসনাদে আহমদ)

অপর একটি হাদীসে এ বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে নবী (স.) বলেছেন : "পারস্পরিক ভালবাসা, সু-সম্পর্ক একে অপরের দয়া মায়া ও স্নেহের ব্যাপারে মুমিনগণ একটি দেহের মতো। দেহের যে অংগেই কষ্ট হোক না কেন, তাতে গোটা দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় ভুগতে থাকতে থাকে।" (বুখারী, মুসলিম)

একজন মুমিনের জান-মাল, ইজ্জত-সম্মান অপর মুমিনের কাছে আমানত। এ আমানতের যদি কেউ খেয়ানত করে তাহলে এর চাইতে বড় অপকর্ম আর হতে পারে না। হাদীস শরীফে এসেছে- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) ও হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী করীম (স.) বলেছেন- একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর যুলুম করে না, তাকে সহযোগিতা করা পরিত্যাগ করে না এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে না। কোন ব্যক্তির জন্য তার কোন মুসলমান ভাইকে হেয় ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করার মত অপকর্ম আর নেই।" (মুসনাদে আহমদ)

ভাই-ভাইয়ের মধ্যে যত দৃঢ় সম্পর্ক থাকুক না কেন তবুও যেই কোন বিষয়ে মতানৈক্য হতেই পারে। কেননা, "যতজন ততমন- রব তব একজন।" তবে কথা হলো মতানৈক্যটি স্থায়ী হতে পারবে না। মতানৈক্য সৃষ্টি হলেই সেখানে মীমাংসার পথ বেছে নিতে হবে এটি হল কোরআনের নির্দেশ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْءَ إِلٰى أَمْرِ اللهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوْا

www.amarboi.org

بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا ۖ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ـــ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْـــوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

If two parties among the Believers fall into a fight, make ye peace between them: but if one of them transgresses beyond bounds against the other, then fight ye (all) against the one that transgresses until it complies with the command of Allah, but if it complies, then make peace between them with justice, and be fair. for Allah loves those who are fair (and just).

The Believers are but a single Brotherhood. So make peace and reconciliation between your two (contending) brothers. and fear Allah, that ye may receive Mercy.

"মুমিনদের মধ্যকার দু'টি দল যদি পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। তারপরও যদি দু'টি দলের কোন একটি দল অপরটির বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে তবে যে দল বাড়াবাড়ি করে তার বিরুদ্ধে লড়াই করো। যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। এরপর যদি তারা ফিরে আসে তাহলে তাদের মাঝে ন্যায় বিচারের সাথে মীমাংসা করিয়ে দাও এবং ইনসাফ করো, আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।

মুমিনরাতো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দাও। আল্লাহকে ভয় করো। আশা করা যায় তোমাদের প্রতি মেহেরবানী করা হবে।" (সূরা আল হুজুরাত : ৯-১০)

অর্থাৎ, একে অপরের সাথে ভ্রাতৃ সম্পর্ক মজবুত করে দাও। ভাইয়ে ভাইয়ে যে ভালোবাসা, দরদ, সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব থাকে, পরস্পরের মধ্যে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করে দাও। কেউ যেন কারো ওপর বিরূপ না থাকে। অবস্থা এরূপ হয়ে গেলে দ্রুত তাদের মিলমিশের ব্যবস্থা করে দেয়া উচিৎ।

রাসূল (স.) বলেছেন– "মুসলমান ভায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিন দিন থাকবে, সামনাসামনি হলে একজন এদিক আরেকজন ওদিক মুখ ফিরাবে এটি কোন মুসলমানের জন্য শোভনীয় নয়। দু'জনের মধ্যে সেই উত্তম যে আগে সালাম দিবে।"

www.amarboi.org

কোরআন ও হাদীসের নির্দেশ আলোকে মুমিনদের পরস্পরের মধ্যে স্থায়ী ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রতি স্থাপনের জন্য যে বিষয়গুলো নিজেদের মধ্যে লালন করতে হবে তা হলো–

১. একে অন্যের জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করা।
২. একে অন্যের সম্মানহানি না করা।
৩. একে অন্যকে তুচ্ছ মনে না করা।
৪. একে অন্যের মনে কষ্ট না দেয়া।
৫. একে অন্যকে দোষারোপ না করা।
৬. একে অন্যকে বিকৃত নামে না ডাকা।
৭. একে অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা না করা।
৮. একে অন্যের পিছনে না লাগা।
৯. একে অন্যের পিছনে গীবত (পরচর্চা) না করা।
১০. একে অন্যের বিরুদ্ধে চোগলখুরি না করা।
১১. একে অন্যকে গালি না দেয়া।
১২. একে অন্যের সম্পদ নষ্ট না করা।
১৩. একে অন্যের বিপদে এগিয়ে আসা।
১৪. একে অন্যের সাথে ভাই ভাইয়ের সম্পর্ক বজায় রাখা।
১৫. একে অন্যের সাথে মনোমালিন্য হলে মীমাংসা করে নেয়া।
১৬. একে অন্যকে কল্যাণমূলক কাজে সহযোগিতা করা।
১৭. একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করা।
১৮. একে অন্যকে সৎকাজে উৎসাহ প্রদান করা।
১৯. একে অন্যের প্রতি মিষ্টভাষী হওয়া।
২০. একে অন্যের জন্য সভা-সমাবেশে জায়গা করে দেয়া।
২১. একে অন্যের জন্য দোয়া করা।
২৩. একে অন্যকে সালাম দেয়া।
২৪. একে অন্যের সালামের উত্তর উত্তমভাবে নেয়া।
২৫. একে অন্যকে সাধ্যানুযায়ী দাওয়াত দেয়া এবং আপ্যায়ন করানো।
২৬. একে অন্যের জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করা।

www.amarboi.org

২৭. সংঘবদ্ধভাবে থাকা।

২৮. সংঘবদ্ধভাবে নামায আদায় করা।

২৯. সংঘবদ্ধভাবে সমাজকল্যাণমূলক কাজ করা।

৩০. সংঘবদ্ধভাবে সত্য প্রতিষ্ঠার কাজ করা।

৩১. সংঘবদ্ধভাবে সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা।

৩২. সংঘবদ্ধভাবে অন্যায়ের প্রতিরোধ করা।

৩৩. সংঘবদ্ধভাবে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

মুমিন হবে ধৈর্যশীল

আল কোরআনে নৈতিক চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য যেসব বিষয়ের ওপর অত্যন্ত জোর দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে ধৈর্যই হচ্ছে মূল ভিত্তি। ধৈর্য যখন মুমিনের মধ্যে পূর্ণভাবে এসে যায় তখন সে সত্য পথে পূর্ণ অবিচলতার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেই কোন প্রকার বিপদের সম্মুখীন হলে সাহস ও হিম্মতহারা না হয়ে পর্বতের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। ব্যর্থতা তার হৃদয়ে কোন জায়গা নিতে পারে না। যখন আপাত দৃষ্টিতে সাফল্যের কোন সম্ভাবনাই দেখা যায়না তখনো মুমিনরা সত্যের পথে টিকে থাকে।

মুমিন ব্যক্তি ধৈর্যের সাথে সত্যের পথে টিকে থাকে যখন, আল্লাহর রহমত তার জন্য অবধারিত হয়ে যায় তখন। ফেরাউনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ বনী ইসরাঈলকে হযরত মূসা (আ.) নসীহত করতে গিয়ে বলেছিলেন : তোমাদের অবস্থা যতই নাজুক ও সংগিন হোক না কেন, সত্যের ওপর অবিচল থাকতে হবে, তাহলে আল্লাহর রহমত, কুদরত ও হিকমত দেখতে পাবে। পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহর, যাকে খুশি তিনি কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ তায়ালার কালামুল হাকীমে প্রায় হুবহু এ বিষয়টি এসেছে–

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ.

Said Moses to his people: Pray for help from Allah, and (wait) in patience and constancy: for the earth is Allah's, to gine as a heritage to such of His servants as He pleaseth, and the end is (best) for the righteous.

www.amarboi.org

"মূসা তাঁর জাতিকে বললো : আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও এবং ধৈর্যধারণ করো (সত্যের ওপর অবিচল থাক)। পৃথিবী আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর যারা তাঁকে ভয় করে কাজ করে চূড়ান্ত সাফল্য তাদের জন্য নির্ধারিত।" (সূরা আল আরাফ : ১২৮)

ধৈর্যের তিনটি পর্যায় রয়েছে। যেমন-

এক. আবেগ উচ্ছ্বাসকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

দুই. কঠিন মুহূর্তেও সত্যের ওপর অবিচল থাকা এবং নিজের নীতি আদর্শকে বিসর্জন না দেয়া।

তিন. সত্যের পথে চলতে গিয়ে যাবতীয় যুলুম নির্যাতনকে হাসিমুখে বরদাশত করা।

ভয়াবহ ও কঠিন পরিস্থিতিতে কোনো ধরনের অভিযোগ না করে চোখের পানি না ফেলে, কাকুতি-মিনতি না জানিয়ে, অস্থিরতা প্রকাশ না করে অটল ও অবিচল থেকে যে ধৈর্যের প্রকাশ ঘটানো হয় তাকেই সর্বোত্তম ধৈর্য বলা হয়। কোরআনের ভাষায় যাকে صَبْرٌ جَمِيْلٌ বলা হয়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَجَاءُوْا عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۖ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ.

They stained his shirt with false blood. He said, Nay, but your minds have made up a tale with you. patience is most fitting. against that which ye assert, it is Allah (alone) whose help can be sought.

"তারা ইউসুফের জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে নিয়ে এসেছিল। একথা শুনে তাদের বাবা বললো, বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি বড় কাজকে সহজ করে দিয়েছে। ঠিক আছে, আমি সবর করবো এবং খুব ভালো করেই সবর করবো। তোমরা যে কথা সাজাচ্ছো তার ওপর একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চওয়া যেতে পারে।" (সূরা ইউসুফ : ১৮)

এখানে যে صَبْرٌ جَمِيْلٌ বলা হয়েছে তার অর্থ হলো, যে সবরের কোন প্রকার অভিযোগ, ফরিয়াদ, ভয়ভীতি ও কান্নাকাটি কিছুই নেই। যে সবরের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন নবী-রাসূলগণ। হযরত ইবরাহীম (আ.) কে আগুনের কুণ্ডে ফেলে

www.amarboi.org

দেয়া হচ্ছে, কিন্তু তার চিত্তে চাঞ্চল্য ঘটেনি। হযরত আয়ুব (আ.) এর গোটা দেহে পঁচন ধরলো। তাঁর আপনজন তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেলো; তিনি কোন অভিযোগ করলেন না। হযরত ইয়াকুব (আ.) সন্তান হারিয়ে এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে পড়লেন, তিনি কোন অভিযোগ করলেন না। বিশ্বনবী (স.) কে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করা হলো একটু বদদোয়াও করলেন না।

হযরত আলী (রা.) বলেছেন : তিনটি সময় ধৈর্য অবলম্বন করার সর্বোত্তম সময়

এক. বিপদ মুসিবতে নিপতিত হলে ধৈর্যধারণ করা।

দুই. মহান আল্লাহর আদেশ পালন করার সময় ধৈর্যধারণ করা।

তিন. আল্লাহর নাফরমানি থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা।

বিপদ মুসিবতে ধৈর্যধারণ করার দৃষ্টান্ত তো পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে (নবী-রাসূলদের ধৈর্য)। মহান আল্লাহর আদেশ-পালন করার সময় ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে, যেমন– নামাযের ক্ষেত্রে। নামাযে যখন কোন মানুষ দণ্ডায়মান হয়, তখনতো সে মহান আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হয়, এক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা যেমনি ধৈর্যহীনতার পরিচয় তেমনি বেয়াদবীর শামিল। অনুরূপভাবে আল্লাহর নাফরমানি থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হলে অবশ্যই ধৈর্যের প্রয়োজন। যেই কোন প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতিতে আল্লাহর নাফরমানি থেকে ধৈর্যের সাথে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। বৃদ্ধ মাতা-পিতা অসুস্থ, অর্থের অভাবে চিকিৎসা করা যাচ্ছে না, স্ত্রীর পরনে কাপড় নেই, সন্তান-সন্ততিকে ভালো পোশাক পরানো যাচ্ছে না এবং ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়ানো যাচ্ছে না, নিজের মাথা গোজার মতো একটি বাড়ি নেই, ভাড়া বাড়িতে বাস করতে হয় বাড়ির মালিক কটু কথা শোনায়, এর বিপরীতে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা হাতছানি দিয়ে ডাকছে, অবৈধ পথে অর্থোপার্জনের অনেক পথ খোলা রয়েছে, ঘুষ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। এসব অবৈধ পথ অবলম্বন করলেই অভাব মোচন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে যে-কোন অবৈধ পথ থেকে নিজেকে পরম ধৈর্যের সাথে বিরত রেখে সততার পথে অটল অবিচল থাকাই হলো, আল্লাহর নাফরমানি থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা।

নাবিয়্যিন, সিদ্দিকীন, শুহাদা ও সালেহীন এই চার শ্রেণীর লোকগণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছেন। আর এটি সম্ভব হয়েছে ধৈর্যের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করার কারণেই। কেননা ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারলে সফলতা অর্জন করা যায় এবং ধৈর্যের মধ্যে রয়েছে অসীম বরকত। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

www.amarboi.org

اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ۚ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

For the present, Allah hath lightened your (burden), for the knoweth that there is a weak spot in you: but, if there are a hundred of you, patient and persevering, they will vanquish two hundred, and if a thousand, they will vanquish two thousand, with the leave of Allah: for Allah is with those who patiently persevere.

"অতএব তোমাদের মধ্যে যদি একশত লোক ধৈর্যধারণকারী হয়, তবে তারা দুইশতের ওপর, আর হাজার লোক এমন হলে দুই হাজার লোকের ওপর আল্লাহর আদেশে বিজয়ী হবে। কিন্তু আল্লাহ কেবল সেই লোকদের সঙ্গী হন, যারা ধৈর্যধারণকারী।" (সূরা আল আনফাল : ৬৬)

সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় যে ধৈর্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে পৃথিবীর সকল সফলতা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে এবং মহান আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি ও তাঁর অনুগ্রহ লাভে সে ধন্য হয়। আর যার প্রতি আল্লাহ তায়ালার রহমতের দৃষ্টি ও অনুগ্রহ নিপতিত হয়, সারা পৃথিবী তার জন্য হয়ে যায়। কবি বলেন-

"আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দৃষ্টি যদি তার কোন গোলামের প্রতি নিপতিত হয় তার সে গোলাম বাদশায় পরিণত হয়ে যায়, তাঁর রহমতের দৃষ্টি যদি এক ফোঁটা পানির প্রতি নিপতিত হয় সে পানি ফোঁটা অগাধ জলধীতে পরিণত হয়ে যায়।"

সুতরাং মুমিন হতাশ হবে না, নিরাশ হবে না, নিথর হবে না এবং ভেঙ্গে পড়বে না। শত প্রতিকূলতার মাঝে সে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে নিজেকে ধন্য করবে। মুমিন দেখতে পাবে তার ভাগ্যাকাশে কালো মেঘ জমা হয়েছে, ঝড়ের পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে, অমাবস্যার এমন কালো ছায়া তাকে আবৃত করছে যার সুবেহ সাদেকের সম্ভাবনার লক্ষণ নেই। তবুও সে হতাশ হবে না, ধৈর্য হারাবে না। মুমিন বিশ্বাস করবে অন্ধকার যতই ঘনীভূত হোক সকালের লাল সূর্য উদিত হবেই হবে। না হয় এই অন্ধকারেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তবুও সে কাপুরুষের ন্যায় অন্যায়ের সামনে মাথা নত করবে না। সে সিদ্ধান্ত নেয় এই বলে–

www.amarboi.org

বিড়ালের ন্যায় নয় বাঁচিব হাজার দিন,
বাঁচিব সিংহের ন্যায় হাজারের একদিন।

মুমিন সত্যবাদী হবে

মুমিন জীবন আর সত্যবাদিতা কখনো আলাদা হতে পারে না। মুমিন মানেই তাকে সত্যবাদী হতে হবে। সে যেমন ছয়টি সত্যের ওপর বিশ্বাস রেখে মুমিন হয়েছে তেমনিভাবে জীবনের প্রতিটি প্রতীক্ষণে সত্যের ওপর অবিচল ও অটুট থাকতে হবে। মুমিন শুধু ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতিই দেয় না, সে মনে প্রাণে বিশ্বাস রেখে কাজের মাধ্যমে বাস্তব প্রমাণ দেয়, মূলত মৌখিক স্বীকৃতি, অন্তরের বিশ্বাস এবং কাজের সমন্বয়ে দিনাতিপাতকারীকেই বলা হয় মুমিন। এ সমন্বয়ের ওপরই মুমিনের যাবতীয় কাজ ও চরিত্র নির্ভরশীল। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ۚ أُولٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ.

Only those are Believers who have believed in Allah and His Messenger, and have never since doubted, but have striven with their belongings and their persons in the cause of Allah: Such are the sincere ones.

"প্রকৃত মুমিনতো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাসী। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংশয়ও তারা পোষণ করে না, আর আল্লাহর পথে জীবন ও সম্পদ দিয়ে লড়াই করে, তারাই সত্যবাদী।" (সূরা আল হুজুরাত : ১৫)

একজন ব্যক্তি যখন সে নিজেকে সত্যবাদী হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইবে তখন তার ওপর প্রথম যে কর্তব্যটি বর্তাবে তা হলো সে নিজেকে সত্যনিষ্ঠ লোকদের সঙ্গী করে নিবে। কেননা আল্লাহ তায়ালার স্বাভাবিক বিধান হলো 'যে যেমন চরিত্রের অধিকারী তার সঙ্গী সাথীও তেমনই জুটিয়ে দেন। মানুষের চিন্তা-চেতনা ও ঝোঁক-প্রবণতা এবং আগ্রহ অনুসারেই তার সঙ্গী জুটে। সমাজের এক শ্রেণীর লোক বলে থাকে, লোকটি এতো ভালো লোক হয়ে খারাপ লোকদের সাথে মিশে কি করে? মূলত একথাটি প্রকৃত সত্যের বিপরীত। প্রকৃতির বিধান হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে যেমন চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা, রুচি-পছন্দ, স্বভাব-প্রকৃতি ইত্যাদির অধিকারী, তার বন্ধু-বান্ধব, সাথী সঙ্গীও অনুরূপ জুটে যায়।

www.amarboi.org

আল কোরআনের ভাষায়- মুমিন হয় মুমিনের বন্ধু আর কাফির হয় কাফিরের বন্ধু। মুমিনের হৃদয়ের বন্ধন থাকে আরেকজন মুমিনের হৃদয়ের সাথে। সুতরাং মুমিনকে সত্যবাদী হতে হলে তাকে অবশ্যই সত্যনিষ্ঠ লোকদের সাথে শামিল হতে হবে। আল্লাহর আদেশ হলো–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ.

O ye who believe! fear Allah and be with those who are truthful.

"হে মুমিন ব্যক্তিরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যনিষ্ঠ লোকদের সঙ্গী হও।" (সূরা আত তাওবা : ১১৯)

সত্যবাদী তাদেরকে বলা হয়েছে যারা কথায়, কাজে ও বিশ্বাসে সততার পরিচয় দেন। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপই যাদের স্বচ্ছতা ও সুন্দরের মোড়কে আবৃত। আল্লাহর নিকট নবীদের পরেই সত্যবাদীদের মর্যাদা নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন–

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيْقًا.

All who obey Allah and the Messenger are in the Company of those on whom is the Grace of Allah, of the prophets, the sincere (lovers of truth), the martyres, and the Righteous (who do good): Ah: How beautiful is their company.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে তাদের সঙ্গী হবে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ দানে ধন্য করেছেন, তারা হলেন- নাবিয়্যিন, সিদ্দিকীন (সত্যবাদী), শুহাদা ও সালেহীন। বস্তুত তারা কতই উত্তম বন্ধু।" (সূরা আন নিসা : ৬৯)

সত্যবাদিতা এমন এক পরশ পাথর যা মুমিনকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়। রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন–

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ اِلَى الْبِرِّ وَانَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ اِلَى الْجَنَّةِ وَانَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا.

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন :

www.amarboi.org

"সত্যবাদিতা লোকদেরকে নেক কাজের দিকে নিয়ে যায়, আর নেক কাজ লোকদেরকে বেহেশতের দিকে নিয়ে যায়। আর কোন লোক যখন নিয়তই সত্য কথা বলতে থাকে, তখন আল্লাহর কাছে সে সিদ্দিক হিসেবে পরিগণিত হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

অর্থাৎ সত্যবাদিতা মুমিনের এমন একটি স্বভাব যা তাকে নিয়তই ভাল কাজ করতে উৎসাহিত করে। আর ভাল কাজ মানুষকে জান্নাতের দিকে ধাবিত করে। আর যে ব্যক্তি নিয়তই সত্য কথা বলেন, সত্য পথে চলেন, সত্যের পক্ষে অবস্থান নেন, আল্লাহর দরবারে তিনি সিদ্দিক হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং আল্লাহ তাকে সিদ্দীকের মর্যাদায় ভূষিত করবেন। যে ব্যক্তি ফরয, ওয়াজিব আদায় করার পর নিজেকে সত্যবাদীদের কাতারে নিশ্চিত করতে পারবেন, বিশ্বনবী (স.) বলেছেন তাঁর জান্নাতে যাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে–

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اضْمَنُوْا لِيْ سِتًّا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اُصْدُقُوْا اِذَا حَدَّثْتُمْ وَاَوْفُوْا اِذَا وَعَدْتُمْ وَاَدُّوْا اِذَا اُئْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ وَغُضُّوْا اَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ.

হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (স.) বলেছেন :

"তোমরা যদি আমাকে ছয়টি বিষয়ের নিশ্চয়তা দিতে পার, তাহলে আমি তোমাদেরকে বেহেশতের নিশ্চয়তা দিতে পারব।

১. যখন কথা বলবে সত্য বলবে,

২. যখন ওয়াদা করবে তা পালন করবে,

৩. আমানত আদায় করবে।

৪. লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে,

৫. চোখ সংযত রাখবে এবং

৬. হাত সংযত রাখবে।" (আহমদ, বায়হাকি)

মুমিন হবে আল্লাহর অনুগত বান্দা

অনুগত বান্দার বহিঃপ্রকাশ হলো, سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا (শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম)। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত ইবরাহীম (আ.) কে আদেশ করলেন اَسْلِمْ হযরত ইবরাহীম (আ.) এতটুকুও দেরি করলেন না সাথে সাথে বললেন

www.amarboi.org

أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ (আমি বিশ্ব প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম) অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বললেন মেনে নাও আর অমনিতেই ইবরাহীম (আ.) মেনে নিলেন। একেই বলা হয় অনুগত বান্দা।

চাকর দু'ধরনের হতে পারে, এক ধরনের হলো- অধীনে আছে বিধায় আদেশ মানতে হবে তাই মানে। যেমন- আবু জেহেল, আবু লাহাব, উৎবা, শায়েবা প্রমুখদের চাকর (দাস)। তাদের চাকরেরা কখনো অনুগত হয়ে তাদের আদেশ নিষেধ মানতো না। বরং অধীনে আছে বিধায় শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে আদেশ-নিষেধ পালন করতো। পালনের ক্ষেত্রে চাকরেরা কোন আত্মতৃপ্তি পেত না এবং মনিবের প্রতি কোন প্রকার ভালোবাসা জন্মাতো না। দ্বিতীয় ধরনের চাকর হলো– অধীনতা নয় বরং মনিবকে সম্পূর্ণ ভালোবেসে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে একান্ত অনুগত হয়ে আদেশ-নিষেধ পালন করে। এক্ষেত্রে কোন রকম অনীহা বা অস্বস্তি আসবে না। নিজের মতো করে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে মনিবের হুকুমগুলো পালন করবে। যেমন- বিশ্বনবী (স.) এর চাকর হযরত আনাস (রা.) দীর্ঘ দশটি বছর রাসূলুল্লাহর (স.) খেদমত করেছিলেন। বিশ্বনবী (স.) দশ বছরে দশবারের জন্যও বলতে হয়নি যে, আনাস এই রকম করেছ কেন অথবা এই রকম করনি কেন? একেই বলা হয় অনুগত চাকর।

অনুরূপভাবে মুমিন আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মান্য করবে এক্ষেত্রে সে আনন্দ উপভোগ করবে, আল্লাহর হুকুমকে সে বোঝা হিসেবে বিবেচনা করবে না। মুমিন আল্লাহর হুকুম মান্য করার মধ্য দিয়ে আল্লাহর সামনে নিজেকে একজন অনুগত বান্দা হিসেবে উপস্থাপন করবে অর্থাৎ আল্লাহর যেই কোন হুকুম কোন প্রকার প্রশ্ন ছাড়াই পালন করতে হবে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে যখনই আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ করলেন সন্তানকে যবাই কর অমনিতেই ইবরাহীম (আ.) পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। অথচ ৮৬ বছর বয়সে আল্লাহ তায়ালা একটি সন্তান দান করলেন। ইবরাহীম (আ.) আপত্তি তুলতে পারতেন হে আল্লাহ তায়ালা সারা জীবন নিঃসন্তান রেখেছ শেষ বয়সে এনে একটি সন্তান দান করলে আর এখন বলছ তা যবাই করতে, এটি কিভাবে সম্ভব? কিন্তু না তিনি কোন প্রকার আপত্তি তুলেননি কোন প্রকার প্রশ্ন করেননি। বরং আল্লাহ তায়ালা আদেশ করলেন আর অমনিতেই তিনি পালন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

অনুগত কাকে বলে? হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর পরিবারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই তার সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে, শিশুকালেই যখন পুত্রকে তাঁর মা-সহ জন-মানবহীন মরুভূমিতে রেখে আসছিলেন, স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন হে

www.amarboi.org

ইবরাহীম আমাদেরকে কেন এখানে রেখে যাচ্ছ? হযরত ইবরাহীম (আ.) বাক শক্তি হারিয়ে ফেললেন, কিছুই বলতে পারলেন না। স্ত্রী এবার বুঝতে পেরে প্রশ্ন করলেন– তাহলে কি আল্লাহর আদেশেই আমাদেরকে রেখে যাচ্ছ? ইবরাহীম আ. শুধু কেবল আঙ্গুল উঁচু করে স্ত্রীকে বুঝিয়ে দিলেন যে, একমাত্র আল্লাহর আদেশেই তোমাদেরকে এখানে রেখে যাচ্ছি। স্ত্রী (হাজেরা) বললেন তাহলে তুমি নিশ্চিন্তে চলে যাও, আমি এবং আমার সন্তান এক আল্লাহর উপরই ভরসা করে থাকবো যার আদেশে আমাদের রেখে যাচ্ছ। এটি ছিল ইবরাহীমের স্ত্রীর অনুগত এর বহিঃপ্রকাশ। এবার ছেলের অনুগত হওয়ার ব্যাপারে আমরা জানতে পারি সরাসরি কোরআন থেকে। পবিত্র কোরআনুল কারীমে বর্ণিত রয়েছে–

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّيْ أَرٰى فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ.

Then, when (the son) reached (the age of) (serious) work with him, he said: O my son: have seen in a dream that I offer thee in sacrifice: now see what is thy view! (the son) said O my father! Do as thou art commanded: thou will find me. if Allah so wills one of the steadfast.

"সে পুত্র (ইসমাঈল) যখন তার সাথে কাজকর্ম করার বয়সে পৌঁছলো, তখন (একদিন) ইবরাহীম (আ.) তাকে (পুত্রকে) বলল : হে পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি তোমকে আমি যবেহ করছি, এখন তুমি বল তোমার রায় কি? সে বললো : হে আব্বাজান! আপনাকে যা হুকুম দেয়া হয়েছে তা করে ফেলুন, আপনি আমাকে আল্লাহ চাহিলে ধৈর্যশীলদের কাতারেই পাবেন।" (সূরা আস সাফফাত : ১০২)

অত্র আয়াত থেকে আমরা ইসমাঈল (আ.) এর যে বৈশিষ্ট্যটি পাই তা হলো তিনি সর্বোচ্চ আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছেন। বাবা বললেন আমি স্বপ্নে দেখেছি ছেলে বললেন আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হলেন অনায়াসেই তা পালন করুন। ইসমাঈল (আ.) বলতে পারতেন যে, আপনি স্বপ্নে দেখেছেন আর অমনিতে ছেলেকে জবাই করতে চলে আসলেন, এ কেমন পিতা হলেন আপনি? আমি আর আপনাকে বাবা বলে পরিচয় দিব না, আমি চললাম।

কিন্তু না : ব্যতিক্রম হল না। পিতা-মাতার মতই দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। ইবরাহীম (আ.) এর পুরো পরিবারই আল্লাহর অনুগত পরিবারে পরিণত হলো।

www.amarboi.org

ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর আদেশে বললেন : أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ. (বিশ্ব প্রতিপালকের দরবারে আমি আত্মসমর্পণ করলাম), হাজেরা বললেন : আল্লাহর আদেশে যদি হয়ে থাকে তাহলে আমাদের এখানে রেখে যাও, কোন আপত্তি নেই। আমরা আল্লাহর ওপরই ভরসা করে থাকবো। ইসমাঈল (আ.) বললেন : আল্লাহ আপনাকে যা আদেশ করেছেন তা আপনি পালন (আমাকে যবাই) করুন। আল্লাহ চাহিলে আমাকে ধৈর্যশীলদের কাতারে পাবেন। আহ! কি কথা, এ কেমন এক জান্নাতি পরিবার। আদিষ্ট হলো আর অমনিতেই সকলে মাথা নত করে আল্লাহর আনুগত্যের সামনে নিজেদের ইচ্ছাকে বিসর্জন করে দিলেন। বাবা, সন্তান সবই আল্লাহর অনুগত বান্দায় পরিণত হয়ে গেলো, আল্লাহ তায়ালা এরকম পরিবার আমাদের সকলকেই দান করুন। আমীন।

একজন মুমিনকে এমনই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে যে, যেখানেই আল্লাহর আদেশ-নিষেধের সম্মুখীন হবে সেখানেই মস্তক অবনত করে দিবে। সাময়িক কোন লোকসান দেখা দিলে অনুগতশীলদের সারি থেকে নড়বে না। সে বলবে যেখানেই আমার রবের আদেশ সেখানেই আমার জন্য কল্যাণ অপেক্ষা করছে। সুতরাং পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাকে তাঁর আনুগত্য থেকে সরাতে পারবে না। সারা পৃথিবী আমার জন্য হয়ে গেলেও সে স্বার্থে একটি মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর অনুগত বান্দাদের সারি থেকে সরে দাঁড়াতে পারব না।

মুমিনের জান-মাল কেবল আল্লাহর জন্যই বিসর্জন হবে

তাগুত শক্তির মোকাবেলায় সত্যের দাওয়াতের জন্য মুমিনগণ যে চেষ্টা-সাধনা করেন, তা হল জিহাদ। এর চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন বাজি রেখে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া। আর এক্ষেত্রে মুমিন আল্লাহর জন্য জীবন নিবে ও দিবে। এক্ষেত্রে কোন প্রকার সংকীর্ণতা থাকতে পারবে না। হয় সে শহীদ হবে অথবা গাজী হয়ে ফিরে আসবে বীরের বেশে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِـــيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا.

Let those fight in the cause of Allah who sell the life of this world for the Hereafter. To him who fighteth in the cause of

www.amarboi.org

Allah whether he is slain or gets victory soon shall we give him a reward of great (value)

"তারা যেন আল্লাহর পথে লড়াই করে, যারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে দেয়, যারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে, অতঃপর নিহত হবে কিংবা বিজয়ী হবে, অচিরেই আমরা তাদেরকে বিরাট প্রতিদান দিব।" (সূরা আন নিসা : ৭৪)

আল্লাহ চাইবেন আর অমনিতেই মুমিন তার জীবন দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে, বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত মোফাসসিরে কোরআন বলেছেন, আমার জীবনটা আমার পকেটে আল্লাহ যখনই চাইবেন তখনই তা আমি বের করে দিব। কেননা এ জীবন মূলত তাঁর নয়, সে মহান আল্লাহর ওপর ঈমান আনার সাথে সাথে নিজের জীবনটুকু জান্নাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছেন। এ জীবন এখন আর তাঁর নয়, তাঁর হচ্ছে এখন জান্নাত লাভের পালা। মুমিন আল্লাহর পথে নিজের জীবন দিয়ে দিবেন আর অমনিতেই জান্নাতের মালিক হয়ে যাবেন। কেননা সেতো জান্নাত ক্রয় করেছে জীবনের বিনিময়ে। তাঁর কাজ হল চুক্তির আলোকে জীবনকে হস্তান্তর করা। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ.

Allah hath purchased of the Believers their persons and their Garden: they fight in His cause, and slay and are Slain.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মরে ও মারে।" (সূরা আত তাওবা : ১১১)

ঈমান শুধু একটি প্রাকৃতিক আকিদা-বিশ্বাসের নাম নয় বরং এটি একটি চুক্তির নাম। এ চুক্তির আলোকেই মুমিন তার নিজের প্রাণ ও ধন-সম্পদ আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দেয়। বিনিময়ে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ নিশ্চয়তা পায় যে, পরকালে পা রাখার পরবর্তী জীবনে তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন। আসলে প্রকৃত কথা হলো আমাদের জান আর মালের প্রকৃত মালিক একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। যিনি আমাদের-সহ ঐ মহাকাশ আর প্রশস্ত যমীন এবং এর মধ্যস্থিত সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাহলে এবার প্রশ্ন আসে আমাদের জান আর

www.amarboi.org

মাল তাঁকে ক্রয় করতে হবে কেন? এর অর্থ কি? এর উত্তর হলো– মূলত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের থেকে আমাদের ইচ্ছাটাকে কিনেছেন অর্থাৎ যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আমরা আমাদের মাল খরচ করতে পারব না এবং যেথায় ইচ্ছা সেথায় আমরা আমাদের জান বা জীবন বিসর্জন করে দিতে পারব না। এ জান আর মাল যেহেতু আল্লাহ তায়ালার, সেহেতু এগুলো একমাত্র তাঁর পথেই বা তাঁর ইচ্ছাধীনেই ব্যয় করতে হবে। না হয় জান্নাতের মালিক হওয়া যাবে না। জান্নাতকে নিজের মালিকানায় আনার জন্য রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে, মুমিন ব্যক্তি কখনো এক্ষেত্রে কার্পণ্য করবে না। সে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে আল্লাহর পথে নিজের জান-মাল তথা ইচ্ছাকে বিসর্জন দেয়ার জন্য। আল্লাহ যখনই চাইবেন তখনই দিয়ে দিবে।

যে জিনিসটি আল্লাহর মালিকানাধীন, যাকে তিনি আমানত হিসেবে মানুষের হাতে সোপর্দ করেছেন এবং যে ব্যাপারে বিশ্বস্ত থাকার বা অবিশ্বস্ত হবার স্বাধীনতা তিনি মানুষকে দিয়ে রেখেছেন সে ব্যাপারে তিনি মানুষের কাছে দাবি করেন, আমার জিনিসকে তুমি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে (বাধ্য হয়ে নয়) আমার জিনিস বলে মেনে নাও এবং সারা জীবন স্বাধীন মালিকের মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নয় বরং আমানতদার হিসেবে তা ব্যবহার করার বিষয়টি গ্রহণ করে নাও। এ প্রসংগে খেয়ানত করার যে স্বাধীনতা তোমাকে দিয়েছি তা তুমি নিজেই প্রত্যাহার করো। এভাবে যদি তুমি দুনিয়ার বর্তমান অস্থায়ী জীবনে নিজের স্বাধীনতাকে (যা তোমার অর্জিত নয় বরং আমার দেয়া) আমার হাতে বিক্রি করে দাও তাহলে আমি পরবর্তী চিরন্তন জীবনে এর মূল্য জান্নাতের আকারে তোমাকে দান করবো।

যে ব্যক্তি আল্লাহর কেনা-বেচা এ চুক্তি সম্পাদন করে সে মুমিন। সৃষ্টি যার আইন চলবে তার, যমীন যার বিধান চলবে তার এটাই ন্যায়সঙ্গত কথা। তাই তো আমরা যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন সবখানেই আল্লাহর হুকুমই বিদ্যমান। কিন্তু আল্লাহর তৈরী সৃষ্টি জগতের শুধুমাত্র মানুষ, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা স্বাধীনতা দান করেছেন, আর তারাই গোলমাল বাঁধায় তারা নিজেদের ও শয়তানের মনগড়া আইন দ্বারা সমাজ চালাতে চেষ্টা করে এবং চালায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللهِ يَبْغُوْنَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ.

www.amarboi.org

Do they seek for other than the Religion of Allah? while all creatures in the heavens and on earth have, willing or unwilling, bowed to His will (accepted Islam), and to Him shall they all be brought back.

"তারা (মানুষেরা) কি আমার আনুগত্য (বিধান) ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন পন্থা (বিধান) গ্রহণ করতে চায়? অথচ ঐ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আমার আনুগত্যের কাছে তারা মাথা নত করে দিয়েছে। আর তাঁরই দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।" (সূরা আল ইমরান : ৮৩)

আর যারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয় তারা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের জন্য যে জীবন বিধান (আল কোরআন) দিয়েছেন সেই বিধান মতো সমাজকে পরিচালনা করার জন্য চেষ্টা করে। যার ফলে খোদাদ্রোহীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং মুমিন ও খোদাদ্রোহীদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগে যায়, মুমিনরা এক্ষেত্রে সীসা ঢালা স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়িয়ে থেকে খোদাদ্রোহীদের আক্রমণের জবাব দেয়। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে প্রয়োজন হলে নিজের জীবনটুকু মহান আল্লাহর জন্যই কোরবান করে দেয় এবং এর মধ্য দিয়ে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে জান্নাত বুঝে নেয়।

মুমিন হবে তাওবাকারী

মুমিনদের যে অপরিহার্য গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে তার মধ্যে অন্যতম গুণ হবে : যখনই বন্দেগীর পথ থেকে তাদের পা পিছলে যাবে তখনই তওবা করে ফিরে আসতে হবে। নিজের সত্য বিচ্যুতির ওপর অবিচল থাকা যাবে না। মানুষের দিনাতিপাতের মধ্য দিয়ে ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, পরিবেশের কারণে বা শয়তানের প্ররোচনায় গুনাহের কাজ ঘটে যাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। অপরাধ হয়ে যেতেই পারে। আর গুনাহ করলে তার জন্য পূর্ব নির্ধারিত শাস্তির বিধান রয়েছে, কোন অপরাধের জন্য কি শাস্তি হবে, কতটুকু অপরাধের জন্য কতটুকু শাস্তি হবে, ইসলামী শরিয়াতে তা স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে। সর্বক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্ধারিত সে শাস্তি থেকে বাঁচার একমাত্র পথ ও পাথেয় হলো তওবা করে ফিরে আসা।

তওবা শব্দের অর্থ রুজু করা বা ফিরে আসা, বিরত থাকা, বন্ধ করে দেয়া, মুছে ফেলা ইত্যাদি। যারা তওবা করে তাদেরকে তায়েব বলা হয় অর্থাৎ গুনাহ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী। আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে একটি নাম হলো

www.amarboi.org

التواب বা রুজুকারী অর্থাৎ যে ব্যক্তি তওবা করল এবং আল্লাহর দিকে ফিরে এলো, আল্লাহ তায়ালা তার দিকে অধিকতর রুজুকারী হবেন বা তার দিকে আল্লাহ তায়ালা অতিদ্রুত এগিয়ে আসবেন। পবিত্র কোরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

If anyone does evil or wrongs his own soul but afterwards seeks Allah's forgiveness, he will find Allah oft-forgiving, Most Merciful.

যে ব্যক্তি গুনাহের কাজ করে অথবা নিজের ওপর অবিচার করে, অতঃপর এজন্যে সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন সে অবশ্যই আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও অতীবও দয়ালু হিসেবে পাবে।" (সূরা আন নিসা : ১১০)

বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

হযরত আগার ইবনে ইয়াসার মুয়ান্নী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন : হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। কেননা, আমি দৈনিক একশতবার (১০০) তওবা করি।" (মুসলিম)

গুনাহ করার পর যে ব্যক্তি তওবা করে না, অনুশোচনা করে না, অনুতপ্ত হয় না, বরং অবলীলাক্রমে একের পর এক অপরাধ করতেই থাকে। এমনকি একপর্যায়ে এসে এখন আর অপরাধকে অপরাধ বলে মনে হয় না। তখন আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান এবং সে আর মুমিনদের কাতারে থাকে না। এই জন্যে শয়তানের চক্রান্তে পড়ে কখনো গুনাহ করে বসলে অবশ্যই চোখের পানি ফেলে তওবা করতে হবে এবং গুনাহ মাফ চাইতে হবে। আর যারাই গুনাহ করার পর ক্ষমা চাইবে তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বিশাল জান্নাতের সু-সংবাদ রয়েছে। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে–

وَسَارِعُوْا إِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ.

Be quick in the race for forgiveness from your Lord and for a Garden whose width is that (of the whole) of the heavens and of the earth, prepared for the righteous.

www.amarboi.org

"দৌড়ে চলো তোমাদের রবের ক্ষমার পথে এবং সেই পথে যা পৃথিবী ও আকাশের সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে চলে গিয়েছে এবং যা আল্লাহভীরুদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।" (সূরা আল ইমরান : ১৩৩)

আল্লাহর রাসূলের আমলে ইজদ গোত্রের একজন ঈমানদার নারী নফসের ধোকায় পড়ে অবৈধ পন্থায় যৌনক্রিয়া করেছিল। অনুশোচনা ফিরে পাওয়া মাত্র আল্লাহর ভয়ে সেই নারীর হৃদয় থর থর করে কেঁপে উঠলো। আহার-নিদ্রা সব তার বন্ধ হয়ে গেল। কিয়ামতের ময়দানে আপন রবের সামনে সে কোন মুখ নিয়ে উঠবে? এ ভয়ে ছুটে আসলো রাসূলের (স.) কাছে এবং নির্দ্বিধায় নিজের অপরাধের বর্ণনা দিলো। রাসূল (স.) তাকে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু সেই নারী তার প্রতি দণ্ডারোপ করার জন্য আল্লাহর রাসূলের কাছে বার বার আবেদন জানাতে লাগলো। অবশেষে রাসূল (স.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : যৌন ক্রিয়ার মাধ্যমে তুমি কি গর্ভবতী হয়েছ? অনুতাপের সাথে নারী জানালো সে গর্ভবতী হয়েছে। আল্লাহর রাসূল (স.) মহিলাকে বললেন : গর্ভের সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

আক্ষেপ করতে করতে মহিলাটি চলে গেলো। সম্মানিত মুমিন ভাই ও বোনেরা, ভালোভাবে একটু চিন্তা করুন মহিলাটিকে প্রহরা দেয়ার জন্য বিশ্বনবী (স.) কোন প্রকার প্রহরী বা গোয়েন্দা নিয়োগ করেননি। দশ মাস পর সন্তান প্রসব হলো কিন্তু সেই নারীর মন থেকে অনুতাপের মাত্র সামান্য পরিমাণও হ্রাস পায়নি। সন্তান কোলে করে মহিলাটি আল্লাহর রাসূলের নিকট এসে পুনরায় দণ্ড প্রয়োগের আবেদন করলেন। রাসূল (স.) বললেন : তোমার দুধে ঐ সন্তানের দুই বছর হক রয়েছে। সেই হক তুমি আদায় করবে এবং সন্তান অন্য কিছু আহরণ না করা পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

মহিলাটির দুই গণ্ড বেয়ে অনুতাপের অশ্রু পড়ছে। চলে গেল সে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সন্তানটিকে রুটি খাওয়া অবস্থায় এনে রাসূলকে দেখিয়ে আবেদন জানালো 'হে আল্লাহর রাসূল (স.) আমার সন্তান দুধ খাওয়া ত্যাগ করেছে এই দেখুন ছেলেটি রুটি খাচ্ছে।' রাসূল (স.) উপস্থিত সাহাবাদেরকে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ যে এই সন্তানকে লালন পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে? একজন দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলো। রাসূল (স.) ঐ লোকটির দায়িত্বে সন্তানটিকে দিয়ে সেই মাহিলাটিকে বক্ষ পরিমাণ মাটিতে গেঁড়ে তার ওপর পাথর নিক্ষেপ করতে আদেশ দিলেন।

www.amarboi.org

হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) মহিলার কাছে গিয়ে তাঁর মাথায় একটি পাথরের আঘাত করলেন, মস্তক ফেটে মগজ আর রক্ত ছিটকে এসে হযরত খালিদ ইবনে অলীদের দেহ স্পর্শ করলো, তিনি মহিলার প্রতি ভর্ৎসনা করলেন। আল্লাহর রাসূল (স.) তা শুনে উপস্থিত সাহাবাদেরকে বললেন : "তোমরা যদি পৃথিবীতে কোন জান্নাতি নারী দেখতে চাও, তাহলে এই নারীকে দেখে নাও। কারণ সে এমনভাবে আল্লাহর দরবারে তওবা করেছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন" মুমিন এভাবেই আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে অপরাধ থেকে তওবা করে ফিরে আসে আর তওবা করা হচ্ছে ঈমানের দাবি।

মুমিন হবে ইবাদতকারী

বিশ্বনবী সাইয়েদেনা মুহাম্মদ (স.) যখন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উর্ধ্বগমন করলেন তখন বন্ধু রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় মূলনীতি দান করেছিলেন। তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান মূলনীতি হলো–

وَقَضٰى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ.

Thy Lord hathdecreed that ye worship none but Him.

"তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন, তোমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩)

একথা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ কারো না কারো আনুগত্য করতে চায়, কারো না কারো সামনে মাথা নত করতে চায়। মানুষ ক্ষুধা লাগলে যেমন খাবারের আশ্রয় গ্রহণ করে, অসুস্থ হলে চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করে, ক্লান্ত-শ্রান্ত হলে বিশ্রামের আশ্রয় গ্রহণ করে, বৃষ্টির শিকার হলে ছাউনির আশ্রয় গ্রহণ করে। তেমনিভাবে মানুষের মধ্যে যখনই বন্দেগীর অনুভূতি জাগ্রত হয়, তখন সে কারো না কারো সামনে মাথা নত করে থাকে। মানুষ যত বড় শক্তির অধিকারী হোক না কেন, একটা অবলম্বন সে চায়। মনস্তত্ত্ববিদগণ গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে, প্রতিটি মানুষের মনই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক এমন একটি শক্তিকে অবলম্বন করতে চায়, যে শক্তির কাছে সে নিজেকে নিবেদন করবে। দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান এমন একটি অবলম্বন সে পেতে চায়, যার কাছে সে নিজেকে নত করে দিতে চায়।

তবে এক্ষেত্রে মুমিন একমাত্র মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে নিজেকে সপে দিবে। শুধুমাত্র আল্লাহর সামনেই মাথা নত করবে। কেবলমাত্র

www.amarboi.org

তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী করবে। কেননা মুমিন অন্তর দৃষ্টি দ্বারা দেখতে পায় সৃষ্টি জগতের সবকিছু একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত করছে। পবিত্র কোরআনুল কারীমে বিষয়টিকে تَسْبِيْحٌ শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। تسبيح শব্দটিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দাঁড়ায় ــ يسبح ــ سبح ــ تسبيحا ــ অর্থাৎ, তাসবীহ পড়েছে, তাসবীহ পড়ছে এবং তাসবীহ পড়বে। এই পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এর মধ্যস্থিত যা কিছু রয়েছে, সমস্ত কিছুই আল্লাহর তাসবীহ ও ইবাদত-বন্দেগী করতে থাকবে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لاَّ تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا.

The seven heavens and the earth, and all beings therein, declare His glory: there is not a things but celebrates His praise, and yet ye understand not how they declare His glory! verily He is oft-forbearing, Most forgiving!

"সাত আকাশ আর যমীন এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর তাসবীহ পড়ছে। এমন কোন বস্তু নেই, যা প্রশংসা-স্তুতির সাথে তাঁর তাসবীহ পাঠ করে না, কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পারো না। নিশ্চয়ই তিনি বড়ই সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৪৪)

আল্লাহর সৃষ্টি চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বৃক্ষ-লতা, সাগর-নদী, আলো-বাতাস, পর্বত-ঝর্ণা ইত্যাদি সবই তাঁরই বন্দেগী বা আনুগত্য করছে। আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলছেন–

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ــ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ.

The sun and the moon follow courses (exactly) computed. And the herbs and the trees-both (alike) bow in adoration.

"চন্দ্র-সূর্য সবই (যার যার অবস্থানে) পরিক্রমণে নিয়োজিত। তারকামালা ও বৃক্ষরাজি আল্লাহকে সেজদা করছে। (সূরা আর রহমান : ৫-৬)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন–

www.amarboi.org

أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللهِ يَبْغُوْنَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ.

Do they seek for other than the Religion of Allah? While all creatures in the heavens and on earth have, willing or un willing, boarded to His will (accepted Islam), and to Him shall they all be brought back.

"তারা (মানুষেরা) কি আমার আনুগত্য (বিধান) ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন পন্থা (বিধান) গ্রহণ করতে চায়? অথচ ঐ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আমার আনুগত্যের কাছে তারা মাথা নত করে দিয়েছে। আর তাঁরই দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।" (সূরা আল ইমরান : ৮৩)

হযরত ইউনুস (আ.) ঘটনাক্রমে মাছের পেটে প্রবেশ করেছিলেন, তিনি জীবিত থাকবেন আশা ছিল না। কিন্তু রাখিলে আল্লাহ মারিবে কে। মাছ স্বাভাবিক হজম শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। বিশাল আকৃতির মাছ হযরত ইউনুস (আ.) কে পেটে নিয়ে সাগরের অতল তলদেশে অবস্থান করছিলো। তিনি মাছের পেটে গভীর অন্ধকারে অবস্থান করে শুনতে পেলেন- সমস্ত দিক থেকে মহান আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করা হচ্ছে। সমুদ্রের তলদেশের ক্ষুদ্র বালুকণা, শৈবালদাম, পাথরের নুড়িসহ সমস্ত কিছু আল্লাহর নামের যিকির করছে। হযরত ইউনুস (আ.) তা শুনে অবাক হয়ে বলতে লাগলেন–

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ.

There is no god but thou: glory to thee: I was indeed wrong!

"তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, পবিত্র তোমার সত্তা, অবশ্যই আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা আল আম্বিয়া : ৮৭)

আল্লাহর ইবাদত মানব প্রকৃতির ঐকান্তিক দাবি। কেননা, বিশ্ব-জাহানের মালিক ও শাসনকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই হলেন আসল মাবুদ বা ইবাদত পাওয়ার একমাত্র মালিক। পবিত্র কোরআন বলছে–

إِنَّ إِلٰـهَكُمْ لَوَاحِدٌ - رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ.

Verily, Verily, your God is one: Lord of the heavens and of the earth, and all between them, and Lord of every point at the rising of the sun!

www.amarboi.org

"তোমাদের প্রকৃত মাবুদ মাত্র একজনই- যিনি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর এবং এর উভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুর রব বা প্রতিপালক এবং সমস্ত উদয়স্থলের প্রতিপালক।" (সূরা আস সাফফাত : ৪-৫)

অর্থাৎ আল্লাহই প্রকৃতপক্ষে মাবুদ হতে পারেন এবং তাঁরই মাবুদ হওয়া উচিৎ। রব (মালিক, শাসনকর্তা ও প্রতিপালক) হবেন একজন আর ইলাহ (ইবাদত লাভের অধিকারী) হবেন আরেকজন, এটা একেবারেই বুদ্ধি বিরোধী কথা। মানুষের লাভ-ক্ষতি, অভাব-প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া, ভাগ্য, ভাংগা-গড়া এবং তার নিজের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বই যার ক্ষমার অধীনে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য স্বীকার করা এবং তাঁর সামনে নত হওয়া মানুষের প্রকৃতিরই দাবি। এটিই তার ইবাদতের মূল কারণ।

একজন মানুষ যখন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওপর মুমিন হয় তখন সে এ দাবিগুলো উপলব্ধি করতে পারে। তাই সে প্রতিনিয়ত একমাত্র, শুধুমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত-বন্দেগীর মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করে। মুমিন প্রতিটি কর্ম সম্পাদনের পূর্বে চিন্তা করে এটি কি আমার আল্লাহর গোলামীর শামিল হবে? এর মধ্যে কি আমার আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে? মুমিন নিজেকে এমন নিয়মে পরিচালনা করবে যে, প্রতিটি নিয়মই হবে তার জন্য একেকটি ইবাদত। ব্যবসা করতে যাবে সেটি হবে ইবাদত, রাজনীতি করতে যাবে সেটি হবে ইবাদত। খেতে যাবে, ঘুমাতে যাবে, কাউকে ভালোবাসবে অথবা ঘৃণা করবে, দান করবে অথবা দান থেকে বিরত থাকবে সবই হবে ইবাদত অর্থাৎ মুমিনের পুরো জীবনটাই হবে ইবাদত, ইবাদত ছাড়া মুমিনের একটি কদমও পড়বে না চলার পথে। যার ফলে সে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন করে পরকালের চিরস্থায়ী ও চির মহাসুখের স্থান জান্নাত লাভ করবে।

মুমিন মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে তার পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা। কেননা, মহান আল্লাহ নিজেই বলেছেন কেন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, কোরআনুল কারীম তার বাস্তব সাক্ষী–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ.

I have only created jenns and men, that they may serve Me.

"আমি জিন এবং মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি"। (সূরা আয যারিয়াত : ৫৬)

www.amarboi.org

সুতরাং প্রতিটি মুমিন আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দিবে একমাত্র সেই মহান আল্লাহর সামনে- যিনি সৃষ্টি জগতের পরিচালক, শাসক ও প্রতিপালক। আল্লাহর ওপর বান্দার যেমন হক রয়েছে, তেমনিভাবে বান্দার ওপর আল্লাহর হক বিদ্যমান। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল (স.) বলেছেন : বান্দার ওপর আল্লাহর হক হচ্ছে, বান্দা কেবলমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে আর আল্লাহর ওপর বান্দার হক হচ্ছে, সেই ইবাদতকারী আবেদ বান্দার জন্য কিয়ামতের দিনে হিসাব নিকাশের পর আল্লাহ জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিয়ে জান্নাত দান করবেন।

মুমিন হবে আল্লাহর প্রশংসাকারী

সূরা ফাতিহায় বলা হয়েছে সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য। একথা বলে সৃষ্টির প্রশংসা করার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে, কেননা ইংরেজী ভাষায় যেমন বাক্যের (Sentence) শুরুতে The শব্দটি আসলে যে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয় সে বিষয়টি নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তেমনিভাবে আরবী ভাষায় বাক্যের (كلام) শুরুতে ال (আলিফ-লাম) আসলে যে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয় সে বিষয়টি নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং সূরা ফাতিহার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ এর প্রথমে ال (আলিফ-লাম) যোগ করে পৃথিবীতে প্রশংসা বলতে যা বুঝায় সবই মহান আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ প্রশংসা হবে একমাত্র, শুধুমাত্র, কেবলমাত্র স্রষ্টার জন্য কোন সৃষ্টির জন্য নয়।

আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করবো আর বলবো আল্লাহ কতই না সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, নিজ সন্তানের প্রতি তাকাবো আর বলবো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য), নিজ যোগ্যতার প্রতি এবং সফলতার প্রতি লক্ষ্য করবো আর বলবো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। সুন্দর বা ভালো স্ত্রী পেলে প্রশংসা করতে হবে আল্লাহর। কেননা পৃথিবীর যেখানে যে জিনিসের মধ্যে যে আকৃতিতেই কোন সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বিরাজমান আছে, আল্লাহর কর্তৃত্বই মূলত তার একমাত্র উৎস। কাজেই একজন মুমিন কোন সৃষ্টিরই প্রশংসা করতে পারে না একমাত্র আল্লাহর ছাড়া। সে সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহরই প্রশংসা করবে। জীবনের প্রতিটি সফলতায় মুমিন একমাত্র আল্লাহরই কর্তৃত্ব খুঁজে পাবে। সমাজে সম্মানজনক ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত, ব্যবসায় সফলতা, ফসলে লাভজনক উৎপাদন, শারীরিক সুস্থতা, জ্ঞানের ভারসাম্যতা- মুমিন মনে করে এসবই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই করুণা, অনুগ্রহ বা দান, এ সকল সফলতার

www.amarboi.org

পেছনে সে অন্য কোন উৎস খুঁজে পাবে না এবং খোঁজার চেষ্টাও করবে না। মুমিন ব্যক্তি সর্বদা উঠা-বসায়, শয়নে-চলনে, গ্রহণে-বর্জনে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসায় নিজেকে নিয়োজিত রাখবে।

মনে রাখতে হবে যে, মুমিন আল্লাহর প্রশংসা করে তাঁর প্রতি ইহসান করে না বরং সে আল্লাহর প্রশংসা করবে এটি হল তার নিকট আল্লাহর অধিকার। শুধু তাই নয়, মুমিন একাই আল্লাহর প্রশংসা করবে বিষয়টি মোটেও এমন নয় বরং আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর প্রশংসায় মত্ত। পবিত্র কোরআনুল কারীম তার বাস্তব প্রমাণ–

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا.

The seven heavens and the earth, and all beings therein, declare his glory: there is not a thing but celebrates His praise, and yet ye understand not how they declare His glory! verily He is oft forbearing, Most forgiving!

"সাত আকাশ আর যমীন এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর তাসবীহ পড়ছে, এমন কোন বস্তু নেই, যা প্রশংসা-স্তুতির সাথে তাঁর তাসবীহ পাঠ করে না, কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পারো না। নিশ্চয়ই তিনি বড়ই সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৪৪)

প্রত্যেকটি প্রাণী থেকে শুরু করে বস্তু পর্যন্ত কেবলমাত্র নিজের রবের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকার কথাই প্রকাশ করছে না বরং এই সংগে তাঁর যাবতীয় গুণে গুণান্বিত ও প্রশংসার অধিকারী হবার কথাও বর্ণনা করছে। প্রত্যেকটি জিনিস তার পরিপূর্ণ অস্তিত্বের মাধ্যমে একথা প্রকাশ করছে যে, তার স্রষ্টা ও ব্যবস্থাপক এমন এক সত্তা, যিনি সমস্ত মহৎ গুণাবলীর সর্বোচ্চ ও পূত অবস্থার অধিকারী এবং প্রশংসা যদি থেকে থাকে তাহলে একমাত্র তাঁরই জন্য আছে।

সুতরাং প্রত্যেকটি মুমিনের বৈশিষ্ট্য হতে হবে কোন কাজের সূচনায় ও সমাপ্তিতে সেই মহান আল্লাহর প্রশংসা করা যিনি তাকে ঐ কাজটি শুরু ও শেষ করার তাওফিক দিয়েছেন। নিজের দেহ থেকে শুরু করে সৃষ্টির যেদিকেই সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে সেদিকেই সে মহান আল্লাহর করুণার প্রকাশ ঘটতে দেখে

www.amarboi.org

স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার কণ্ঠ থেকে মহান আল্লাহর প্রশংসা বাণী উচ্চারিত হতে থাকবে। মহান আল্লাহর প্রত্যেকটি নেয়ামত ব্যবহার-ভোগ করার সময় মুমিন আল্লাহর প্রশংসা করবে। জীবনের প্রত্যেকটি সময় অতিবাহিত করার সময় কিভাবে দয়াবান আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে এ ব্যাপারে আমাদের প্রিয় নেতা বিশ্বনবী (স.) শিখিয়ে গিয়েছেন। নিদ্রা যাওয়া, নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া, পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করা, নতুন বস্ত্র পরিধান করা, পাদুকা পরিধান করা, আয়নায় নিজের চেহারা দেখা, কোথাও রওয়ানা করা, বাজারে যাওয়া, রোগী দেখতে যাওয়া, কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া, আহার গ্রহণ করা, আহার শেষ করা, স্ত্রী সহবাস করা ইত্যাদি কাজের সময় রাসূল (স.) নানা ধরনের দোয়ার মাধ্যমে মহাপরাক্রমশালী দয়াবান আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করতেন। মুমিন প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রিয় রাসূলের (স.) শেখানো দোয়াগুলো পাঠের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসায় নিজেকে ব্যস্ত রাখবে।

মুমিন আল্লাহর যমীনে ভ্রমণ করে

পবিত্র কোরআনে যমীনে বিচরণকারী বুঝানোর জন্য اَلسَّائِحُوْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর এর অর্থ শুধু ঘুরাফেরা করা বুঝানো হয়নি। বরং এমন উদ্দেশ্যে যমীনে ভ্রমণ করা যা পবিত্র ও উন্নত এবং যার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। পৃথিবীতে ঘুরবে, চলা-ফেরা করবে আর আল্লাহর নিদর্শনের জ্ঞান অর্জন করবে যার মধ্য দিয়ে আল্লাহর পরিচয় লাভ করবে এবং তাঁর পরিচয় মানুষের সামনে উপস্থাপন করবে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জিহাদ করা, কুফর শাসিত এলাকা থেকে সাময়িক হিজরত করা, দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া, পরিচ্ছন্ন ও কল্যাণকর জ্ঞান অর্জন করা, মানুষের চরিত্র সংশোধন করা, আল্লাহর নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ করা এবং হালাল জীবিকা অর্জন করার জন্য বের হওয়াই হলো, اَلسَّائِحُوْنَ এর অর্থ।

মুমিন জীবনের প্রথম এবং প্রধান কাজই হল সর্বদা সে এক আল্লাহর বন্দেগী করবে, তাঁর হুকুম মেনে চলবে প্রতিটি ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে যদি কোন ভূখণ্ডে পরিবেশ পরিস্থিতি আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, আল্লাহর ইবাদত বা হুকুম পালন করার সুযোগ না পাওয়া যায় তাহলে মুমিন ইবাদত পালনের প্রতিকূল জায়গা থেকে অনুকূল জায়গায় হিজরত করবে। তবুও পরিবেশ-পরিস্থিতির অজুহাতে আল্লাহর ইবাদত বা হুকুম পালন করা থেকে দূরে থাকা যাবে না। হিজরত অর্থ আল্লাহর জন্য সম্পর্কহীন হয়ে যাওয়া। ঐসব

www.amarboi.org

জিনিস থেকে মুমিনের সম্পর্কচ্ছেদ করা উচিত যেগুলো আল্লাহর ভালোবাসার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। হোক সেটি মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, কর্তৃত্ব-ক্ষমতা কিংবা জন্মভূমি। মহান আল্লাহর ইবাদতকে টিকিয়ে রাখার জন্য যা করার দরকার তাই করতে হবে। আল্লাহর নির্দেশ হলো–

يعِبَادِيَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّ أَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ.

O My servants who belive truly, spacious is My Earth therefore serve ye Me (and me alone).

"হে আমার ইবাদতকারী মুমিন বান্দাগণ! আমার যমীন বেশ প্রশস্ত, কাজেই তোমরা (যে যেখানেই সুযোগ পাও সেখানেই) আমার ইবাদত কর।" (সূরা আল আনকাবূত : ৫৬)

মুসলিম জাতির জনক হযরত ইবরাহীম (আ.) এক আল্লাহর ইবাদত করতেন। কিন্তু যখনই তাঁর পিতা 'আযর' তাঁর ইবাদতের জন্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তখনই তিনি যমীনে বিচরণ করে হলেও এক আল্লাহর ইবাদত করবেন বলে ঘোষণা দিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্ববাসীর জন্য বিষয়টিকে কোরআনুল কারীমে কোড করে দিয়েছেন–

يَا أَبَتِ إِنِّيْ قَدْ جَاءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْ أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ــ يَا أَبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ــ يَا أَبَتِ إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ــ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِيْ يَا إِبْرَاهِيْمُ ۖ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ــ قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ۖ إِنَّهُ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ــ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَأَدْعُوْ رَبِّيْ عَسٰى أَلاَّ أَكُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّيْ شَقِيًّا.

O my father! to me hath come knowledge which hath not reached thee: So follow me: I will guide thee to a way that is even and straight. O my father! serve not satan for satan is a rebel against (Allah) Most Gracious. O my father! fear lest a chastisement afflict thee from (Allah) Most Gracious so that

www.amarboi.org

thou become to satan afriend. (The father) replied: aft thou shrinking from my gods, O Abraham? If thou forbear not, I will indeed stone thee: now get away from me for a good long while! Abraham said: peace be on thee: I will pray to my Lord for they forgiveness: for He is to me Most Gracious.

And I will turn away from you (all) and from those whom ye invoke besides Allah: I will call on my Lord perhaps, by my prayer to my Lord I shall be not unblest.

"হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি, তাই আমার অনুসরণ করুন। আমি আপনাকে সরল পথ দেখাবো। হে পিতা! শয়তানের বন্দেগী করবেন না, অবশ্যই শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমার ভয় হয় দয়াময়ের কোন শাস্তি না আপনার ওপর এসে পড়ে, তখন আপনি শয়তানের দলে পড়ে যাবেন। পিতা বললো- হে ইবরাহীম তুমি কি আমার উপাস্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো? যদি তুমি বিরত না হও, পাথর নিক্ষেপে তোমাকে হত্যা করবো। তুমি আমার সামনে থেকে চিরদিনের জন্য দূর হয়ে যাও। ইবরাহীম (আ.) বললেন– আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমি আমার পালনকর্তার কাছে আপনার জন্য প্রার্থনা করবো। অবশ্যই তিনি আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল। আমি আপনাদের এবং আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে ডাকেন তাদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকবো। আশা করি আমার প্রতিপালকের ইবাদত করে বঞ্চিত হবো না।" (সূরা মারইয়াম : ৪৩-৪৮)

বেঈমান-মুনাফিকরা দেশ ভ্রমণ করে নিছক ভোগ-বিলাসের পরিধি বিস্তৃতির লক্ষ্যে অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে, আনন্দ-ফূর্তি লাভ, স্বাস্থ্য পরিবর্তন, দেহ ও মনের বাসনা-কামনা পূরণ ইত্যাদি বৈষয়িক উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করে থাকে। পক্ষান্তরে আল্লাহর প্রিয় মুমিন বান্দাগণ বিশেষভাবে পাঁচটি উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করে থাকে। যেমন–

এক. আল্লাহর নিদর্শনাবলী অবলোকনের উদ্দেশ্যে

মহামহিয়ান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গোটা পৃথিবীতে অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে রেখেছেন। মুমিনরা তা ঘুরে ঘুরে অবলোকন করে আর আল্লাহর প্রতি ঈমানকে মজবুত করে। পৃথিবীতে যারা আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহ করেছে এবং ধ্বংস হয়েছে, মুমিনরা সেসব ধ্বংসস্তূপ দেখে শিক্ষা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে

www.amarboi.org

দেশ ভ্রমণ করে থাকে। আর তা অবলোকনের জন্য আল্লাহ তায়ালা নিজেই নির্দেশ করেছেন–

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ــ هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ.

There have been examples that have passed away before you travel through the earth, and see what was the end of those who rejected truth. Here is a plain statement to men, a guidance and instruction to those who fear Allah.

"তোমাদের আগে অনেক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করে দেখে নাও যারা (আল্লাহর বিধান ও হিদায়াতকে) মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে। এটি মানব জাতির জন্য একটি সুস্পষ্ট সতর্কবাণী এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ।" (সূরা আল ইমরান : ১৩৭-১৩৮)

দুই. তিনটি ঘর যিয়ারতে উদ্দেশ্যে

কোন মানুষ যদি কোন দেশ বা অঞ্চলে ভ্রমণ করে তাহলে সেখানে অবস্থিত কারো কবর সে যিয়ারত করতে পারে কোন আপত্তি নেই। আল্লাহর এই ভূমণ্ডল এর অধিকাংশ মুসলিম দেশ এবং অনেক অমুসলিম দেশে আল্লাহ তায়ালার ওলী, বুযুর্গ বা সালেহীনদের কবর রয়েছে। মানুষ যখন সেসব দেশে কোন কারণে যাবে, তখন তাদের কবর যিয়ারত করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এককভাবে হোক অথবা দলবদ্ধভাবে হোক ভ্রমণে বের হওয়া যাবে না, এই পৃথিবীতে তিনটি ঘর ব্যতিত অন্য কোন ঘর বা মাজার যিয়ারতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় বা সওয়াবের আশায় ভ্রমণ করা যাবে না। সে তিনটি ঘর সম্পর্কে রাসূল (স.) স্পষ্ট ভাষণ দিয়েছেন–

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلٰى ثَلٰثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدُ الْحَرَمِ وَمَسْجِدِىْ هٰذَا وَالْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى.

"মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের আশায় ভ্রমণ শুধুমাত্র তিনটি মসজিদ যিয়ারতের জন্য করা যাবে, তা হলো– ১. মসজিদে হারাম, ২. আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী) ৩. মসজিদে আকসা। এছাড়া আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন স্থাপনে ভ্রমণ করবেনা।" (বুখারী ও মুসলিম)

www.amarboi.org

তিন. দ্বীন প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে

দ্বীন মানে হলো জীবন ব্যবস্থা বা জীবন চলার পদ্ধতি। যে ব্যবস্থা বা পদ্ধতি মানব সম্প্রদায়ের জন্য। এ মানব সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন এক আল্লাহ তায়ালা। আর এ মানব সম্প্রদায় শুধু নির্দিষ্ট কোন অঞ্চল বা দেশে বসবাস করছে না। বরং সারা পৃথিবী জুড়েই মানুষের বসবাস। মানুষের জন্য নির্দিষ্ট জীবন ব্যবস্থা মানুষেরই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই করেছেন। সুতরাং তাঁর রচিত জীবন ব্যবস্থা সারা পৃথিবী জুড়ে বসবাসরত সকল মানুষকে মেনে চলতে হবে। কারণ হল আল্লাহ তায়ালা নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠীর জন্য এ জীবন ব্যবস্থা তৈরী করেননি বরং করেছেন সারা দুনিয়াবাসীর জন্য। আল্লাহ তায়ালাই ঘোষণা করছেন-

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ۗ قُلْ لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٰى لِلْعَالَمِيْنَ.

Those were the (Prophets) who received Allah's guidance. Follow the guidance they received, say : No reward for this do I ask of you : this is but a Reminder to the nations.

"(হে মুহাম্মদ) তারাই আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত প্রাপ্ত ছিল, তাদেরই পথে তুমি চল এবং বলে দাও, এ (তাবলীগ ও হেদায়াতের) কাজে আমি তোমাদের কাছ থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না। এটিই (কোরআনুল কারীম) সারা দুনিয়াবাসীর জন্য একটি সাধারণ উপদেশমালা।" (সূরা আল আনআম : ৯০)

সুতরাং সারা দুনিয়াবাসীর জন্য আল্লাহ তায়ালা যে উপদেশ প্রদান করেছেন সে উপদেশ দেশ-দেশান্তরে পৌঁছানোর জন্য মুমিন বিশ্ব ভ্রমণ করবে। রাসূল (স.) এর নির্দেশ হলো–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَلَاحَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (بخارى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন : একটি আয়াত (বাক্য) হলেও তা আমার পক্ষ্য থেকে (মানুষের কাছে)

www.amarboi.org

পৌঁছে দাও। আর বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আলোচনা করো তাতে কোন দোষ নেই, আর যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা কথা (জাল হাদীস) রচনা করে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (বুখারী)

আল্লাহর বিশাল-বিস্তৃত এ পৃথিবীর অনেক অঞ্চল রয়েছে যেখানে এখনো আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবীবের উপদেশাবলী সঠিকভাবে পৌঁছেনি অথবা পৌঁছলেও তারা ভুলে বসেছে। দ্বীনের দাওয়াত সেখানে প্রচার ও প্রসার নেই। মুমিন এতটুকু দায়িত্ব পালনের জন্য সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর প্রশস্ত ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করবে।

চার. দ্বীনি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে

ইসলাম নতুন করে যাত্রা শুরু করেছিল জ্ঞানের প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় রাসূলের সাথে কথা শুরু করেছিলেন পড়ার উপদেশ দিয়ে। তিনি বললেন–

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ.

Proclaim! (Read) in the name of thy Lord and Cherisher, who created. Created man, out of a leechlike clot.

"(হে রাসূল) পড়ুন! আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাট বাঁধা রক্তের দলা থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আল আলাক : ১-২)

শুধু তাই নয় আল্লাহ তায়ালা মানব সম্প্রদায়ের যাত্রা শুরু করেছিলেন জ্ঞান শিখানোর মধ্য দিয়ে। আল্লাহ বলেন–

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ.

And He taught Adam the names of all things then He placed them before the anglels, and said Tell Me the names of these if ye are right.

"আর আল্লাহ আদমকে সমস্ত জিনিসের নাম শেখালেন তারপর সেগুলো পেশ করলেন ফেরেশতাদের সামনে এবং বললেন, যদি তোমাদের ধারণা সঠিক হয় (কোন প্রতিনিধি নিযুক্ত করলে ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত হবে) তাহলে বলতো দেখি এই জিনিসগুলোর নাম কি?" (সূরা আল বাকারা : ৩১)

www.amarboi.org

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত আদম (আ.) কে জ্ঞান শিখিয়ে দিয়ে সমস্ত সৃষ্টি জগতের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন। তাই কেয়ামত পর্যন্ত যারাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হবেন তাঁরাই সমসাময়িক সমাজের সবচাইতে মর্যাদার অধিকারী হবেন। পবিত্র কোরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوْ رَحْمَةَ رَبِّــهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.

Is one who worships devoutly during the hours of the night prostrating himself or standing, who takes heed of the Hereafter, and who places his hope in the Merey of his Lord. (like one who does not)? Say: Are those equal, those who know and those who do not know? It is those who are endued with understanding that receive admonition.

(এ ব্যক্তির আচরণ সুন্দর না সে ব্যক্তির আচরণ সুন্দর) যে অনুগত, রাতের বেলা দাঁড়ায় ও সেজদা করে, আখেরাতকে ভয় করে এবং নিজের রবের রহমতের আশা করে? এদের জিজ্ঞেস করো যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি পরস্পর সমান হতে পারে? কেবল বিবেক-বুদ্ধির অধিকারীরাই উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা আয যুমার : ৯)

সুতরাং মুমিনের দেশ ভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে জ্ঞান আহরণ করা। জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া আর জিহাদের জন্য বের হওয়ার মর্যাদার সমান। রাসূল (স.) এর হাদীসে এসেছে–

وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে (জিহাদের মধ্যে) অবস্থান করে।" (তিরমিযী)

অন্য হাদীসে এসেছে–

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

www.amarboi.org

وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَبْتَغِىْ فِيْهِ عِلْمًا سَلَاكَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا. (ترمذى)

হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে পথ চলে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর জন্য জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ ও সুগম করে দিবেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকারীগণের জন্য নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেন।" (তিরমিযী)

পাঁচ. হালাল উপার্জনের উদ্দেশ্যে

নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ দেয়া, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করা এবং সমাজ কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার জন্য মুমিন অধিক হালাল অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে দেশ সফর করবে এতে কোন বাধা নেই। ইসলাম এর জন্য অনুমোদন দিয়েছে। পবিত্র কোরআনুল কারীম তার বাস্তব প্রমাণ–

عَلِمَ أَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَآخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَآخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

He knoweth that there many be (some) among you in ill-health, others travelling through the land, Seeking of Allah's bounty, yet others fighting in Allah's Cause.

"তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যকার কিছু লোক হবে অসুস্থ, কিছু লোক আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে ভ্রমণরত এবং কিছু লোক আল্লাহর পথে লড়াই করে।" (সূরা আল মুযযাম্মিল : ২০)

হালাল ও বৈধ উপায়ে রুজি অর্জনের উদ্দেশ্যে সফর করাকে কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর মেহেরবানী ও করুণা অনুসন্ধান বলে আখ্যায়িত করেছে। ইসলামে বৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জন করা বড় ধরনের মর্যাদার কাজ বলে আখ্যায়িত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (স.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন শহর বা জনপদে খাদ্যদ্রব্য রোজগারের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসে এবং সে দিনের বাজার দরে তা বিক্রি করে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে।" (ইবনে মারদুইয়া)

www.amarboi.org

মুমিন রুকুকারীদের সাথেই রুকু করে

পৃথিবীতে নবী-রাসূল থেকে শুরু করে সিদ্দিকীন, সালেহীন যারাই এসেছিলেন, কেউই নিজে নিজে একাকীভাবে আল্লাহর হুকুম পালন করেননি। বরং দলবদ্ধভাবেই মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হুকুম পালন করেছেন। সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর সামনে মাথা অবনত করেছেন। এই জন্যেই বিশ্বনবী (স.) মদিনায় হিজরত করে প্রথমেই মসজিদ তৈরি করলেন। হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে মুয়াযযিন হিসেবে নিয়োগ দিলেন। হযরত বিলাল (রা.) দৈনিক পাঁচবার আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিতেন। আর সকল মুমিনগণ দলে দলে এসে একত্রিত হয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আল্লাহর সামনে দলবদ্ধভাবে মাথা নত করতে লাগলেন অর্থাৎ রাসূলের সাথে রুকু ও সেজদা দিতে লাগলেন। একপর্যায়ে এসে, দলবদ্ধভাবেই আল্লাহর সামনে মাথা নত করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ এসে যায়। পবিত্র কোরআনুল কারীম তাঁর সাক্ষী–

وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ.

And be steadfast in prayer: give Zakat, and bow down your heads with those who bow down (in worship).

"নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং যারা আমার সামনে মাথা অবনত (রুকু) করে তাদের সাথে তোমরাও অবনত হয়ে যাও।" (সূরা আল বাকারা : ৪৩)

আল্লাহর সামনে রুকু ও সেজদা করা প্রত্যেক যুগেই দ্বীন ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। অন্যান্য নবী রাসূলদের ন্যায় বনী ইসরাঈলদের নবী-রাসূলগণও এর প্রতি কঠোর তাগিদ দিয়েছিলেন। কিন্তু ইহুদীরা এ ব্যাপারে গাফেল হয়ে পড়েছিল। তাদের সমাজে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থাপনা প্রায় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে বেশির ভাগ লোক ব্যক্তিগত পর্যায়েও নামায ছেড়ে দিয়েছিল। আর এটাই স্বাভাবিক যে, সামষ্টিক কোন বিষয় যদি ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে আসা হয় তাহলে এক পর্যায়ে তা বিলীন হয়ে যায়। এজন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর মুমিন বান্দাদের বলেছেন যে, তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু করো অর্থাৎ জামায়াতে নামায আদায় করো।

আল্লাহর নবী (স.) যখন মৃত্যু শয্যায়, কখনো হুঁশ কখনো বেহুঁশ। হযরত

www.amarboi.org

আয়েশার কোলে নবীজীর (স.) মাথা। জ্ঞান ফিরে এলো নবীজীর। বললেন- এখন কোন সময়? হযরত আয়েশা বললেন, নামাযের জামায়াতের সময় হয়ে গেছে। আপনার সাহাবীগণ অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর আমার বাবার ইমামতিতে নামায শুরু করলেন। বিশ্বনবী (স.) বললেন, আয়েশারে আমার মাথাটা একটু উঁচু করে ধরো। হযরত আয়েশা (রা.) আদেশ মতো নবীজীর মাথা উঁচু করে ধরলেন। দোজাহানের বাদশাহ (স.) খেজুর পাতার বেড়ার উপর দিয়ে সাহাবীদের নামাযের জামায়াতের দৃশ্য অবলোকন করলেন। নামাযের দৃশ্য দেখার পর বললেন, আয়েশারে এবার আমার মাথাটা আগের মতো করে রাখ। হযরত আয়েশা (রা.) আগের মতোই নিজের উরুর ওপর বিশ্বনবীর মাথা রেখে শুয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) দেখতে পেলেন নবীজীর দু'চোখের কোণা দিয়ে পানি বেয়ে বেয়ে পড়ছে। হযরত আয়েশা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.) আপনি কাঁদছেন কেন? নবীজী বললেন : আয়েশারে! এটি কোন দুঃখের কান্না নয় বরং তৃপ্তির কান্না। যে জামায়াতের জন্য আমি তায়েফের ময়দানে রক্তাক্ত হয়েছি, যে জন্য আমাকে দন্ত হারাতে হয়েছে। আজ আমি দেখতে পাচ্ছি আমার অনুপস্থিতিতেও আমার সাহাবীরা সেই নামায আদায় করছে। এই দেখে আমার আত্মবিশ্বাস জন্মেছে- কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতরা নামাযের জামায়াতকে সু-প্রতিষ্ঠিত রাখবে।

একজন মুমিনের হৃদয় সর্বদা মসজিদের সাথে মিশে থাকবে। যখনই নামাযের সময় হয়, মুয়াযযিন বলেন حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة (নামাযের দিকে এসো) তখনই মুমিন পার্থিব জীবনের সকল ব্যস্ততাকে উপেক্ষা করে মাথা নতকারীদের সাথে মিলিত হয়ে আল্লাহর সামনে মাথা নত করে। সে সর্বদা সজাগ থাকে মানসিকভাবে, না জানি কখন আমার নামাযের জামায়াত ছুটে যায়। মুমিন এক ওয়াক্তের পর পরবর্তী ওয়াক্তের (জামায়াতের) জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। আর আল্লাহ তায়ালা রুকুকারীদের সাথে রুকুকারী মুমিনদের জন্য রহমতের দরজা খুলে দেন। বিষয়টি হাদীসে কুদসীতে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْرِعًا قَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ : اَبْشِرُوْا هٰذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ اَبْوَابِ السَّمَآءِ وَيُبَاهِىْ بِكُمُ الْمَلَآئِكَةَ ــ يَقُوْلُ انْظُرُوْا اِلٰى عِبَادِىْ قَدْ قَضَوْا فَرِيْضَةً وَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَ اُخْرٰى ــ

www.amarboi.org

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : একদা আমরা রাসূল (স.) এর সাথে মাগরিবের নামায পড়লাম। অতঃপর যারা চলে যাবার তারা চলে গেলেন, আর যারা অপেক্ষা করার তারা মসজিদে থেকে গেলেন। এমন সময় রাসূল (স.) উর্ধ্বশ্বাসে দ্রুত মসজিদ পানে ছুটে এলেন। দ্রুতবেগে আসার কারণে তার হাঁটু উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি এসে মসজিদে অবস্থানরত লোকদের বললেন : সুসংবাদ গ্রহণ করো, তোমাদের রব আকাশে একটি (রহমত ও বরকতের তৈরি) দরজা খুলে দিয়েছেন। তোমাদের প্রশংসা করে তিনি ফেরেশতাদের বলছেন : দেখো! আমার বান্দাদের, যারা একটি ফরয আদায় করে আরেকটি ফরযের অপেক্ষায় রয়েছে। (সুনানে ইবনে মাজাহ)

মুমিন ব্যক্তি যখন মসজিদে জামায়াতের জন্য যাতায়াত করবে আর আসা-যাওয়ার পথে অন্য যেই কোন জল্পনা-কল্পনা করবে, পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, পরিকল্পনা-কর্মসূচী স্থির করবে, আল্লাহ তায়ালা এসব কিছু তাঁর আমলনামায় লিপিবদ্ধ করিয়ে দেন। হাদীস শরীফে এসেছে−

عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ لَاَعْلَمُ اَحَدًا اَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ كَانَتْ لَاتُخْطِئُهُ صَلَاةٌ فَقِيْلَ لَهُ لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِى الظَّلْمَاءِ وَفِى الرَّمْضَاءِ فَقَالَ مَا يَسُرُّ فِىْ اَنَّ مَنْزِلِىْ اِلٰى جَنْبِ الْمَسْجِدِ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ يُكْتَبَ لِىْ مَمْشَاىَ اِلَى الْمَسْجِدِ وَرَجُوْعِىْ اِذَا رَجَعْتُ اِلٰى اَهْلِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَمَعَ اللّٰهُ لَكَ ذَالِكَ كُلَّهُ.

উবাই ইবনে কাব (রা.) থেকে বর্ণিত, আনসারদের মধ্যে এক ব্যক্তির ঘর নবী (স.) এর মসজিদ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ছিলো। কিন্তু তিনি প্রতি ওয়াক্ত নবী (স.) এর মসজিদে এসে নামায পড়তেন। কোন নামায (জামায়াত) না পড়ে ছাড়তেন না। কোন এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, গরমের সময় এবং রাত্রে মসজিদে আসার জন্য একটি খচ্চর কেন কিনছেন না? তিনি (আনসার) উত্তর দেন, আমি মসজিদের কাছে ঘর পছন্দ করি না। কারণ, আমি চাই আমি পায়ে হেঁটে মসজিদে যাই। আর যাওয়া আসায় যতো পদক্ষেপ গ্রহণ করি তা আমার আমলনামায় লিখা হোক। রাসূল (স.) একথা শুনে বললেন : ওর প্রত্যেক পদক্ষেপের সওয়াব আল্লাহ তাকে দান করবেন। (মুসলিম)

www.amarboi.org

মুমিন সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে

মুমিনের পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্যই হলো সে মানুষদেরকে সৎকাজে আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে বারণ করবে। এ দায়িত্ব সরাসরি আল্লাহ তায়ালাই দান করেছেন। কুরআনুল কারীম তার বাস্তব দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ.

Ye are the best of peoples evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and beliveing Allah.

"তোমরাই সর্বোত্তম জাতি (উম্মত)। মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে বারণ (নিষেধ) করবে আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।" (সূরা আল ইমরান : ১১০)

সৎকাজের প্রতি আন্তরিক টান, সৎকাজের বিস্তৃতি এবং সৎকাজের প্রতি আগ্রহ পক্ষান্তরে অন্যায় কাজের প্রতি ঘৃণা, অন্যায় কাজে প্রতিরোধ প্রচেষ্টা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একজন মুমিন সারাক্ষণ সৎকাজের চিন্তায় বিভোর থাকে। সৎকাজকে সর্বদা নিজের মধ্যে লালন করে থাকে এবং তা বাস্তবায়নে সক্রিয় থাকে। পক্ষান্তরে মুমিনের হৃদয়ের সকল অশান্তি ও অস্থির উৎসাহ ও পাথেয় হলো অন্যায় কাজ। হরিণ যেমন বাঘের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়ালে রাখার চেষ্টা করে। তেমনিভাবে মুমিন নিজেকে দুনিয়ার সকল অপরাধ প্রবণতা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে অর্থাৎ অসৎ কাজ আর মুমিনের মধ্যে সম্পর্কটি হল অহিনকূল সম্পর্ক। কোন মতেই সে অসৎ কাজকে সহ্য করতে পারে না। শুধু তাই নয় যেই কাউকে অন্যায়ে লিপ্ত দেখলে মুমিন বিব্রতবোধ করে। অন্যায়ের প্রতি স্বাভাবিক যে ঘৃণা মুমিনের অন্তরে সে ঘৃণাই অন্যায়কে রুখে দাঁড়ানোর প্রবণতাকে বাড়িয়ে দেয়। তাই কোন দ্বীনি ভাই অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ার পর তা থেকে না ফেরা পর্যন্ত মুমিন সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে তাকে ন্যায় পথে ফিরিয়ে আনার জন্য।

প্রতিটি মুমিনের উপরই সত্যের প্রচার বা কল্যাণের দিকে আহ্বান এবং অসত্য বা অকল্যাণ থেকে মানুষকে বিরত রাখা কর্তব্য। এটি তার ঈমানের দাবি। এতটুকু কাজ যদি সে না পারে বুঝে নিতে হবে যে, তার মধ্যে ঈমানের লেশমাত্র নেই।

www.amarboi.org

যতই সে নিজকে মুমিন বলে দাবি করুক না কেন আসলে সে মুমিন নয়। তাকে অবশ্যই তার অবস্থার আলোকে সত্য মিথ্যার পক্ষ-বিপক্ষ নিতে হবে। হাদীস শরীফে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِن الْخُدْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَاَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ ــ (مسلم)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (স.)কে বলতে শুনেছি : তোমাদের কেউ যখন কোন খারাপ কাজ হতে দেখে সে অবশ্যই তা হাত দিয়ে (ক্ষমতার আলোকে বল প্রয়োগে) স্তব্ধ করে দিবে। যদি সে এ ক্ষমতা না রাখে তবে সে মুখের (বুঝানোর মধ্য দিয়ে) দ্বারা তা বন্ধ করে দিবে। যদি সে এ ক্ষমতাটুকুও না রাখে তবে সে অন্তর দ্বারা এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে। আর এটাই হলো ঈমানের দুর্বলতম স্তর। (মুসলিম)

সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ যখন মুছে যাবে কোন সমাজ থেকে, তখন সে সমাজে আল্লাহর আযাব ও গযব নেমে আসে। সে আযাব ও গযব থেকে মুক্তির জন্য যতই আল্লাহর কাছে দোয়া করা হোক না কেন কোন লাভ হবে না। রাসূল (স.) ইরশাদ করেন–

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْلَيُوْشِكَنَّ اللهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ. (ترمذى)

হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স.) বলেছেন : আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ। অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখবে। নতুবা তোমাদের ওপর শীঘ্রই আল্লাহ আযাব নাযিল করে শাস্তি দিবেন। অতঃপর তোমরা তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য দোয়া করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল হবে না। (তিরমিযী)

দিনাতিপাতে একজন মুমিনের অভ্যাসে পরিণত হবে যে, সে সৎকাজে লোকদের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে। সে সহ্যই করতে পারবে না যখন দেখতে পাবে তার পাশে আল্লাহর কোন আদেশ বর্জন হচ্ছে অথবা কোন

www.amarboi.org

নিষেধ গ্রহণ হচ্ছে। মুমিন নিজে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য যেমন ব্যস্ত থাকবে তেমনিভাবে তার প্রতিবেশী ও পরিবারকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধগুলো মান্য করানোর মধ্য দিয়ে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশও অনুরূপ। পবিত্র কোরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْآ قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُوْنَ اللهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

O ye who believe! Save your Selves and your families from a fire whose fuel is men and stones, over which are (appointed) angels stern (and) severe who flinch not (from excuting) the commands do they receive from Allah, but do (precisely) what they are commanded.

"হে মুমিন লোকসকল! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার ও সন্তান-সন্ততিকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। সেখানে রুঢ় স্বভাব ও কঠোর হৃদয় ফেরেশতারা নিয়োজিত থাকবে যারা কখনো আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না। তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তাই পালন করে।" (সূরা আত তাহরীম : ৬)

আল্লাহর আযাব থেকে শুধু কেবল নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর মধ্যেই কোন মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রকৃতির বিধান যে পরিবারটির নেতৃত্বের বোঝা তার কাঁধে স্থাপন করেছে তার সদস্যরা যাতে আল্লাহর প্রিয় মানুষ রূপে গড়ে উঠতে পারে সাধ্যমত সে শিক্ষা দীক্ষা দেয়াও তার কাজ। তারা যদি জাহান্নামের পথে চলতে থাকে তাহলে যতটা সম্ভব তাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করা। তার সন্তান-সন্ততি পৃথিবীতে সুখী হোক তার শুধু এই চিন্তা হওয়া উচিত নয়। বরং এর চেয়েও তার বড় চিন্তা হওয়া উচিত এই যে, তারা যেন আখেরাতে জাহান্নামের ইন্ধন না হয়। আর মনে রাখতে হবে নিজের অসচেতনতার কারণে যদি নিজ পরিবারের সদস্যরা জাহান্নামের ইন্ধন হয় তাহলে যতই আপনি আমলদারী হোন না কেন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কমই থাকবে। আপনার প্রতিবেশী বা

www.amarboi.org

পরিবারের মধ্যে যারাই আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে তাদের ব্যাপারে জবাব দিয়ে তারপরই আপনার আমল বলবে আপনি জাহান্নামে যাবেন না কি জান্নাতে যাবেন। এ ব্যাপারে রাসূল (স.) এর দৃষ্টিভঙ্গি হলো–

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন : তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তাকে তার অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। (বুখারী)

একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য কখনো এমন হওয়া উচিত নয় যে, সে শুধু মসজিদে মসজিদে ঘুরে আল্লাহ-বিল্লাহ করবে, তাসবীহ-তাহলীল করবে আর মসজিদের বাহিরে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অমান্য হতে চলবে এবং অন্যায় কাজে সমাজ ছেয়ে যাবে। সে এ বিষয়ে তেমন কর্ণপাত বা দৃষ্টিপাত করবে না। নিজে মসজিদে নিরাপদে ঘুমাবে আর বাহিরে মানবতা ধ্বংসিত হতে থাকবে। শয়তানের রাজত্ব চলবে, দুশ্চরিত্রদের কর্তৃত্ব চলবে, যুলুম শাহীতে ডুবে মরবে দেশ ও জাতি। তা কখনোই হতে পারে না। তা না হয় আল্লাহর রাসূল (স.) কেন তায়েফের ময়দানে রক্তাক্ত হলেন! উহুদের ময়দানে কেন দন্ত মোবারক হারালেন? অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর আগের ও পরের পুরো জীবনকে নিষ্পাপ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কোরআন তার সাক্ষী–

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ـ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا.

Verily we have granted thee a manifest victory. That Allah may forgive thee thy foults of the past and those to follow, fulfil His favour to thee, and guide thee on the Straight way.

"(হে নবী) আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি, যাতে আল্লাহ আপনার আগের ও পরের সব ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করে দেন। আপনার জন্য তাঁর নিয়ামতকে পূর্ণত্ব দান করেন এবং আপনাকে সহজ সরল পথ দেখিয়ে দেন।" (সূরা ফাতহ : ১-২)

মুমিনদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, আল্লাহর জান্নাত সরবি কলা আর দুধের সরের মধ্যে নয় বরং জান্নাত হলো তরবারির অগ্রভাগে। জান্নাত পাওয়া সহজ বিষয় নয়। ঈমান এনে আপনি নিজেকে মুমিন বলে দাবি করলেই আল্লাহ তায়ালা আপনাকে জান্নাত দিয়ে দিবেন না। বরং জান্নাত দানের আগে আল্লাহ আপনাকে

www.amarboi.org

অনেক পরীক্ষা করবেন যেমন পরীক্ষা করেছিলেন আমাদের পূর্ববর্তীদের। মনে রাখতে হবে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হলে আপনাকে অবশ্যই পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেতে হবে। একজন ছাত্রকে যেমন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হলে তাকে অবশ্যই পরীক্ষার কেন্দ্রে বা হলে যেতে হয়। পরীক্ষার হলে না গেলে পরীক্ষার চান্স পায় না এবং পরীক্ষা দিতে পারে না। যার ফলে সে পরীক্ষার সুফল নিজের জীবনে বয়ে আনতে উপযোগী বা সক্ষম হয় না। অনুরূপভাবে জান্নাত লাভের পরীক্ষার কেন্দ্র বা হল হলো সত্য প্রতিষ্ঠা মিথ্যা উৎখাতের আন্দোলনের ময়দান বা রাজপথ, মসজিদ নয়। মসজিদ পরিকল্পনার কেন্দ্র হতে পারে কিন্তু লড়াইয়ের কেন্দ্র নয়। যে বা যারা সে ময়দান বা রাজপথ নামক পরীক্ষার কেন্দ্রে না যাবে সে পরীক্ষার চান্স বা সুযোগ পায় না এবং পরীক্ষা দিতে পারে না। যার ফলে সে পরীক্ষার সুফল নিজের পরকালীন জীবনে বয়ে আনতে সক্ষম বা উপযোগী হবে না। আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে বলেছেন–

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُّتْرَكُوْا أَنْ يَّقُوْلُوْا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُوْنَ ــ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّــذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ــ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ.

Do men think that they will be leftalone on saying, we believe and that they will not be tested? We did test those before them, and Allah will certainly know those who are true from those who are false.

"মানুষ কি ভেবে নিয়েছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তারা ছাড় পেয়ে যাবে এবং কোন পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী।" (সূরা আল আনকাবুত : ২-৩)

ঈমান কেবল মুখ দিয়ে উচ্চারণ করার নাম নয় বরং ঈমান হলো একটা গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ আকিদা। একটি ঝুঁকিপূর্ণ আমানত, এমন একটি জিহাদ যা জয় করতে ধৈর্যের প্রয়োজন এবং এমন এক সাধনা যার সাফল্যের জন্য সহিষ্ণুতা অপরিহার্য। সুতরাং এটা যথেষ্ট নয় যে, আমি ঈমান এনেছি' এ দাবি করেই শুধু ঘরে মসজিদে যাতায়াত করবে। বরং এ দাবি করার পর ব্যক্তিকে অবশ্যই সত্য মিথ্যার পক্ষে বিপক্ষে অবস্থান নিতে হবে। যার ফলে সে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। আর সে পরীক্ষায় এমনভাবে উত্তীর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসতে হবে যে, তার ঈমানে

www.amarboi.org

কিছুমাত্র ভেজাল অবশিষ্ট থাকবে না এবং সামান্যতম দুর্বলতা আসবে না। সোনা আগুনে পোড়ালে যেমন তার খাদ পৃথক হয়ে যায় তদ্রূপ আল্লাহর নেয়া পরীক্ষায় ঈমান ও বেঈমানকে পৃথক করে ঈমানকে খাঁটি করে তোলে।

ঈমানের পরীক্ষা আল্লাহর চিরস্থায়ী মূলনীতি। যে কেউ নিজেকে মুমিন বলে দাবি করলেই তার ওপর পরীক্ষা অপরিহার্য হয়ে যায়। মক্কার যে ব্যক্তিই নিজকে মুমিন বলে পরিচয় দিতো এবং সত্য মিথ্যার পক্ষে বিপক্ষে অবস্থান নিতো। সৎকাজের আদেশ দিতো আর মন্দ কাজ হতে মানুষকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করতো। তখন তার ওপর পরীক্ষাস্বরূপ বালা-মুসিবতের পাহাড় ভেঙ্গে পড়তো। এমন নির্যাতন-নিপীড়ন এসে পড়তো যে, সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তায়ালা আজমায়ীন অতীষ্ঠ হয়ে যেতেন। তার একটি প্রমাণ হাদীস শরীফ থেকে জানা যায় : হযরত খাব্বাব (রা.) বলেন; একদিন আমি দেখলাম বিশ্বনবী (স.) ছাদ বা ঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে আছেন। আমি উপস্থিত হয়ে আরয করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহি (স.) আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করবেন না? আমরাতো আর নির্যাতন সহ্য করতে পারছি না, মার খেতে খেতে শেষ হয়ে গেলাম।

এই কথা শুনা মাত্র নবী করীম (স.) এর মুখমণ্ডল আবেগে রক্তবর্ণ ধারণ করলো। তিনি বললেন : "হে খাব্বাব, তোমাদের পূর্ববর্তীদের ঈমানদারদের ওপরতো এর চেয়েও কঠোর নির্যাতন চালানো হতো। তন্মধ্যে কোন কোন ঈমানদারকে ধরে এনে যমীন গর্ত করে কোমর পরিমাণ গেঁড়ে দিয়ে তাঁর মাথার ওপর করাত চালিয়ে তাঁকে দ্বিখণ্ডিত করা হতো। কারো কারো গায়ের গোস্ত লোহার চিরুনি দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলা হতো। এই সব কিছুর মূল উদ্দেশ্যই ছিল লোকদিগকে ঈমান থেকে ফিরিয়ে রাখা। আল্লাহর কসম! মুমিনদের এই ত্যাগ ও সাধনা পূর্ণ হবেই। শেষ পর্যন্ত অবস্থা, এমন হবে যে, এক ব্যক্তি সানয়া হতে হাদরামাউত পর্যন্ত নির্বিঘ্নে সফর করবে এবং এ সময় আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় তার মধ্যে থাকবে না।"

সুতরাং একজন মুমিন, পথ যত কঠিনই হোক না কেন সে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে মানুষকে বারণ করেই যাবে। কোন বাধাই তাকে রুখে দিতে পারবে না। বরং সে এ নীতিতেই বিশ্বাসী হবে যে,

বিড়ালের ন্যায় নয় বাঁচিব হাজার দিন,
বাঁচিব সিংহের ন্যায় হাজারের একদিন।

www.amarboi.org

মুমিন আল্লাহ্ দেয়া সীমা রক্ষা করে

সূর্য উদিত হওয়ার মধ্য দিয়ে দিন শুরু হয় এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্য দিয়ে দিন শেষ হয় অর্থাৎ রাতের আগমন ঘটে আবার সূর্য উদিত হওয়ার মধ্য দিয়ে রাত শেষ হয় অর্থাৎ দিনের যাত্রা শুরু হয়। এ রুটিন হলো মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই কর্মের ও হুকুমের বহিঃপ্রকাশ। এ রাত আর দিনের আলোকেই মানুষকে তার কর্মসূচী নির্ধারণ করতে হয়। এ কর্মসূচী একেক জন একেক পন্থায় সম্পাদন করে থাকে। কেউ সম্পাদন করে বিভিন্ন দার্শনিক পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীকে কেন্দ্র করে, কেউ সম্পাদন করে বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্র ও দলকে কেন্দ্র করে আবার কেউ সম্পাদন করে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে তথা তাঁর বেধে দেয়া সীমারেখাকে কেন্দ্র করে। আর যারা আল্লাহ দেয়া সীমারেখায় তাদের দিনাতিপাত করে থাকে তারাই হলেন মুমিন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

And observe the limits set by Allah, (those do rejoice) So proclaim the glad tidings to the Believers.

"তারা (মুমিনরা) আল্লাহর দেয়া সীমারেখা সংরক্ষণকারী। আর মুমিনদের জন্য সুসংবাদ।" (সূরা আত তাওবা : ১১২)

মুমিনগণ নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কর্মকাণ্ড আল্লাহ দেয়া সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখে। কখনো এ সীমা অতিক্রম করে ইচ্ছাকৃত নিজেদের জীবন পরিচালনা করে না। এখানে আল্লাহর দেয়া সীমারেখা বলতে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও তাঁর হুকুম-বিধানকেই বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ, চিন্তা-চেতনা, আনুগত্য-অনুসরণ, ঈমান, আকিদা, নৈতিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, সামাজিকতা, বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, স্বরাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, মুসলিম অমুসলিম সম্পর্ক, একে অন্যের প্রতি দায়িত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক কথায় মানব জীবনের রান্নাঘর থেকে পল্লী ভবন পর্যন্ত বিদ্যালয় থেকে আদালত পর্যন্ত, ব্যক্তি জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত সকল পর্যায়ের জন্য একমাত্র বিধানদাতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে নীতি-নির্ধারণ দান করেছেন সেই নীতি নির্ধারণই হলো আল্লাহ দেয়া সীমারেখা।

মুমিন ব্যক্তি এই সীমার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রেখে দিনাতিপাত করবে। নিজের

www.amarboi.org

ব্যক্তিগত হোক অথবা সমষ্টিগত হোক সকল কর্মকাণ্ড এই সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখবে। কখনো এ সীমা অতিক্রম করে ইচ্ছামত কাজ করবে না। আবার কখনো আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মনগড়া আইনকে বা মানুষের তৈরী করা ভিন্নতর আইনকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করবে না। কেননা, আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে সতর্কমূলক ভাষা দিয়ে অবগত করে দিয়েছেন। কুরআনুল কারীম তার সাক্ষী–

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

If anyone desires a religon other than Islam (Submission to Allah), never will it be accepted of him, and in the Hereafter he will be in the ranks of those who have last.

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে চায় তার সে পদ্ধতি কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের (ব্যর্থ, আশাহত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত) অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা আল ইমরান : ৮৫)

আল্লাহ দেয়া সীমারেখা একটি স্বতন্ত্র চিন্তা ও কর্ম ব্যবস্থা এবং একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা। যার মধ্যে জীবনের সমস্ত প্রশ্নের নীতিগত বা বিস্তারিত জবাব পাওয়া যায়। হেদায়াত ও পথ নির্দেশ লাভ করার জন্য এখন আর কোন অবস্থায়ই তার বাইরে যাবার প্রয়োজন নেই। দ্বীনকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য যথেষ্ট (Enough) করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন মুমিনদের গলায় প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া আর কারো আনুগত্য ও বন্দেগীর শৃঙ্খল নেই। এখন আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যেমন মুমিনরা একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যকারী, ঠিক তেমনি কর্ম জীবনেও আল্লাহর ছাড়া আর কারোর আনুগত্যকারী নয়। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনুল কারীমে ঘোষণা করেছেন–

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا.

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (জীবনব্যবস্থা) কে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করেছি এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে দিয়েছি।" (সূরা আল মায়েদা : ৩)

মানুষ দিনের পর রাত রাতের পর দিন এর মাঝে অতিবাহিত করে তার জীবন। তবে এক্ষেত্রে মুমিনের একটি কেন্দ্র বিন্দু রয়েছে, সেই কেন্দ্র বিন্দুর আলোকেই সে তার জীবন পরিচালনা করে থাকে। মুমিন পার্থিব জীবনে যা কিছুই করুক না

www.amarboi.org

কেন, তার অন্তর দৃষ্টি থাকে সেই কেন্দ্র-বিন্দুর দিকে, আর সেই কেন্দ্র-বিন্দুর নাম হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক দেয়া সীমারেখা অর্থাৎ মহাগ্রন্থ আল কোরআনুল কারীম। এই জন্যই রাসূল (স.) মুমিনের জীবনকে খুঁটিতে বাঁধা ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন অর্থাৎ খুঁটিতে বাঁধা ঘোড়া যেমন খুঁটির চতুর্দিকেই ঘুরতে-ফিরতে পারে কিন্তু খুঁটিকে উপেক্ষা করে যেতে পারে না। হাদীস শরীফে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْاِيْمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِىْ اخِيَّتِه يَحُوْلُ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلىٰ اخِيَّتِه وَاَنَّ الْمُؤْمِنِ يَسْهُوْ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى الْاِيْمَانِ فَاَطْعِمُوْا طَعَامَكُمُ الْاَتْقِيَاءَ وَاُولُوْ مَعْرُوْفَكُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেছেন : মুমিন ব্যক্তি ও ঈমানের উপমা হচ্ছে খুঁটিতে বাঁধা ঘোড়া। সে চতুঃসীমার মধ্যে ঘুরে ফিরে আবার খুঁটির কাছে চলে আসে। অনুরূপভাবে মুমিন ব্যক্তি ভুল করে বসে, কিন্তু পুনরায় ঈমানের দিকে ফিরে আসে।

অতএব তোমরা মুত্তাকী লোকদের নিজেদের খাবার খেতে দাও এবং ঈমানদারদের সাথে সদয় ব্যবহার করো।" (বায়হাকী)

মুমিন কখনো নিরাশ ও হতাশ হয় না

একজন খাঁটি মুমিনের হৃদয়ে কখনো কোন হতাশা ও নিরাশা কাজ করবে না এবং বাসা বাঁধবে না। কোন দুঃখ বেদনায় সে ভেঙ্গে পড়বে না। কারণ হলো মুমিন বিশ্বাস করে– خَيْرِه وَشَرِّه مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى (ভালো হোক মন্দ হোক সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত)। তার ভালো মন্দের চাবি কাঠি আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ। পৃথিবীর কেউই তার কল্যাণ বা অকল্যাণ কোন কিছুই সাধন করতে পারবে না। মুমিনদের হৃদয়ে যখন কোন বিপদ-মুসিবত আসে, তখন তারা বিচলিত হয় না এবং হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে না বরং ধৈর্যের পরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বলে–

اَلَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

Who say, when afflicted with calamity : to Allah we belong, and to Him is our return.

www.amarboi.org

"(মুমিন লোকেরা এমন যে,) কোনো বিপদ যখন তাদেরকে বেষ্টন করে তখন তারা বলে, আমরা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই দিকে ফিরে যাব।" (সূরা আল বাকারা : ১৫৬)

নমরুদ যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) কে আগুনে নিক্ষেপের সকল প্রস্তুতি শেষ করলো। ইবরাহীম (আ.) দেখতে পাচ্ছেন আগুনের কুণ্ডলি তাঁর জন্য প্রস্তুত করা হলো অত্যন্ত উত্তপ্তভাবে। চারদিকে সবাই প্রদক্ষিণ করতে প্রস্তুত। সবাই এ আনন্দ উৎসব উদযাপনে মানসিক সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করলো। ইবরাহীম (আ.) লক্ষ করলেন, নমরুদ তাঁকে এখনই আগুনে নিক্ষেপ করবে যার মধ্য দিয়ে নমরুদের দৃষ্টিতে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর একত্ববাদের কথা বলার মতো আর কেউই থাকবে না। একমাত্র তারই কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব কায়েম থাকবে। তার বিরুদ্ধে কথা বলার মতো কেউই থাকবে না। সে যা বলবে তাই প্রতিষ্ঠিত হবে, যেমনটি চিন্তা করেছিল দারুন নদওয়ার বৈঠকে- মুহাম্মদ (স.) কে শেষ করে দিতে পারলেই আমরা এবং আমাদের মূর্তিগুলো বেঁচে যাই।

এমনি মুহূর্তে ফেরেশতারা চলে আসলো ইবরাহীমের ধারে সাহায্য করার প্রত্যয়ে। ফেরেশতারা এসে বললো, হে ইবরাহীম আমাদের কাছে সাহায্য চাও আগুন থেকে বাঁচিয়ে দেই, পূর্ণ মুমিন হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন : হে ফেরেশতারা, তোমরা চলে যাও আর আমাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দাও। আমিতো এমন আল্লাহর ইবাদত করি না যিনি আমার দুঃখ-দুর্দশা স্ব-চক্ষে দেখেন না। আমি আগুনে পুড়ে মারা গেলে যদি আমার আল্লাহ খুশি হন তাহলে আমার এমন আল্লাহকে খুশি করার জন্য হাজার বারও আগুনে পুড়তে রাজি আছি। অমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা আগুনের প্রতি নোটিশ জারি করে দিলেন–

قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ.

We said, o fire! be thou cold, and (a means of) safety for Abraham!

"হে আগুন, আমার ইবরাহীমের প্রতি শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হয়ে যাও।" (সূরা আল আম্বিয়া : ৬৯)

আগুন আল্লাহর আদেশ মতে শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। কারণ আগুন তো হলো সৃষ্টি আর আল্লাহ হলেন স্রষ্টা। তাই আগুন তো আল্লাহর কথাই শুনবে। রাসূলের চাচা এবং তার স্ত্রী যখন জানতে পারলো তাদের পরিণতি সম্পর্কে সূরা

www.amarboi.org

লাহাব অবতীর্ণ হয়েছে তখন সে পাথর খণ্ড নিয়ে আল্লাহর রাসূলকে আঘাত করার জন্য বসে থাকলো।

কিছুক্ষণ পর রাসূল (স.) আবু বকরকে সাথে নিয়ে কাবায় প্রবেশ করলেন। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আবু লাহাবের চোখ থেকে তাঁর রাসূলকে অদৃশ্য করে দিলেন। আবু লাহাব হযরত আবু বকর (রা.) কে জিজ্ঞেস করলো কোথায় মুহাম্মদ (স.)? আমি জানতে পারলাম সে আমার সম্পর্কে শাস্তির কথা বলছে। তাঁকে এখন কাছে পেলে এ পাথর দিয়ে আঘাত করতাম।

একথা বলে আবু লাহাব গর্বিত ভঙ্গিতে চলে গেলো। হযরত আবু বকর (রা.) রাসূল (স.) থেকে জানতে চাইলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আবু লাহাব আপনাকে দেখতে পেলো না কেন?

বিশ্বনবী (স.) উত্তর দিলেন : "হে আবু বকর! সে আমাকে দেখতে পায়নি। কেননা আল্লাহ তায়ালা তার চোখকে আদেশ দিয়েছিলেন, যেন সে আমাকে দেখতে না পায়।" (সুবহানাল্লাহ)

অর্থাৎ সৃষ্টি যার হুকুম চলবে তার। আল্লাহর সৃষ্টি আগুন নির্দেশ পেলো ইবরাহীমের প্রতি এয়ার কণ্ডিশন হওয়ার জন্য আগুন দেরি করেনি। উত্তপ্ত আগুন এয়ার কণ্ডিশনে পরিণত হয়ে গেলো।

হযরত ইবরাহীম (আ.) হতাশ হলেন না, নিরাশ হলেন না, বরং তিনি এক আল্লাহর ওপরই ভরসা করেছিলেন, যার ফলে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশে আগুনের কুণ্ড ফুল বাগানে পরিণত হয়ে যায়। এই জন্যই বিশ্বকবি আল্লামা ইকবাল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন–

'আজভি হো যো ইবরাহীম কা ঈঁমা পয়দা,

আগকার ছাকতি হ্যায় এক আন্দাজে গুলিস্তা পয়দা।'

অর্থাৎ, ইবরাহীম (আ.) এর ন্যায় ঈমান যদি বর্তমানেও কারো ভেতরে বিদ্যমান থাকে, তাহলে তার জন্যও প্রজ্বলিত আগুন ফুলের বাগানে পরিণত হতে পারে। কেননা ইবরাহীমকে বাঁচিয়ে ছিলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সে আল্লাহ কর্তৃত্ব সহকারে আজও বিদ্যমান রয়েছেন।

মুমিন কখনো হতাশ হবে না নিরাশ হবে না। জীবনের সর্বশেষ পর্যন্তও মুমিন আল্লাহর ওপরই ভরসা করবে সে বিশ্বাস করবে তার কল্যাণ অকল্যাণের নির্ধারক

www.amarboi.org

হলেন একমাত্র শুধুমাত্র, কেবলমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি যদি তাকে কোন ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত করে পরীক্ষা নিতে চান, তবুও সে হতাশ না হয়ে আল্লাহর উপরই ভরসা করবে। কেননা সে জানে আল্লাহই বলেছেন যে, তিনি মুমিনদের বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করবেন যা পবিত্র কুরআনে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ.

Be sure we shall test you with Something of fear and hunger, some loss in goods, lives and the fruits of (your toil), but give glad tidings to those who patiently persevere.

"আর নিশ্চয়ই আমরা ভীতি, অনাহার, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে এবং উপার্জন ও আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে তোমাদের (মুমিনদের) পরীক্ষা করবো।" (সূরা আল বাকারা : ১৫৫)

উক্ত আয়াতের পরিপূর্ণ বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয় হযরত আয়ুব (আ.) এর জীবনে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী হযরত আয়ুব থেকে সকল দিক থেকে পরীক্ষা নিয়েছিলেন। আয়ুব (আ.) এর ধন-সম্পদ, ছেলে-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন সবকিছু তাঁর কাছ থেকে হারিয়ে গেলো। দেহ পঁচে গেলো-পোকা ধরলো। যার কারণে আল্লাহ ছাড়া তাঁর কাছে কেউই রইলো না। এরপরও তিনি সামান্যতম হতাশ হননি, নিরাশ হননি। বরং সর্বশেষ যখন তাঁর জিহ্বাতেও পোকা ধরলো তখন তিনি শুধু এতটুকুই বললেন– যা পরবর্তীতে মুমিনদের জন্য আল্লাহ তায়ালা কোরআনুল কারীমে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

إِذْ نَادٰى رَبَّهُ أَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

When he cried to his Lord truly distress has seized me, but thou art the Most Merciful of those that are Merciful.

"স্মরণ করো, যখন সে (আয়ুব) তার রবকে ডাকলো, আমি রোগগ্রস্ত হয়ে গিয়েছি আর তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাকারী।" (সূরা আল আম্বিয়া : ৮৩)

কঠিন এ মুহূর্তে হযরত আয়ুব (আ.) যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁর সে

www.amarboi.org

ভূমিকা সম্পর্কে মহান আরশে আযীমের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে যে সনদ দান করেছেন যা মুমিনদের জন্য অত্যন্ত শিক্ষণীয়। আল্লাহ বলেন-

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ.

Truly we found him full of patience and constancy. How excellent is the servant, Ever did he turn (to us)!

"আমি তাঁকে (আয়ুবকে) সবরকারী পেয়েছি, উত্তম বান্দা ছিল সে, সে নিজের রবের অভিমুখী।" (সূরা সা'দ : ৪৪)

এমনই হন আল্লাহর প্রিয় মুমিন বান্দাগণ! যখন বিপদের ও কঠিন সংকটের মুখোমুখি হন তখন তারা তাদের রবের কাছে অভিযোগ করবেন না বরং ধৈর্য সহকারে তাঁর চাপিয়ে দেয়া পরীক্ষাকে মেনে নেন এবং তাতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তাঁর কাছেই সাহায্য চান। কিছুকাল আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার পর যদি বিপদ অপসারিত না হয় তাহলে তার থেকে নিরাশ হয়ে অন্যদের দরবারে হাত পাতবেন, এমন পদ্ধতি তারা অবলম্বন করেন না। বরং, তারা ভালো করেই জানেন যা কিছু পাওয়ার আল্লাহর কাছ থেকেই পাওয়া যায়। তাই বিপদের ধারা যতই দীর্ঘ হোক না কেন তাঁরা কেবল তারই করুণা প্রার্থী হন। এজন্য তারা এমন দান ও করুণা লাভে ধন্য হন যার দৃষ্টান্ত হযরত আয়ুবই (আ.) যথেষ্ট।

বিপদ-মুসিবত যতই কঠিন হোক না কেন মুমিন তা খুব সহজেই হজম করে চলে। সে কখনো মিথ্যার কাছে মাথা নত করে না। যেমনটি মাথা নত করেননি ইতিহাসের অন্যতম নির্যাতনের স্বীকার হযরত বিলাল (রা.)। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর মনিব উমাইয়া বিন খালাফ তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন করতে লাগলো। দ্বিপ্রহরের ক্ষরতাপে অগ্নিস্নাত তপ্ত বালুকার উপর সে হযরত বিলালকে চিৎ করে শুয়ে দিয়ে তাঁর বুকের ওপর পাথর চাপা দিয়ে রাখত। উপরে প্রচণ্ড সূর্যোতাপ-নিচে আগুনের কয়লার মতো বালু। তার ওপর চাবুকের আঘাত। মাঝে মাঝে ঘোড়ার পায়ের সাথে বেঁধে ঘোড়াকে তাড়িয়ে দেয়া হতো। যার ফলে পুরো দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেতো। এই ধরনের নিষ্ঠুর অত্যাচারের উদ্দেশ্যই ছিল হয় তিনি মারা যাবেন, নতুবা অসহ্য হয়ে ইসলাম ত্যাগ করবেন।

কিন্তু আল্লাহর প্রিয় মুমিন বান্দা-মর্দে মুজাহিদ প্রিয় আল্লাহকে ভুলেননি বরং নিষ্ঠুর কাফেরেরা যখন মাঝে মধ্যে আঘাত বন্ধ করে বলতো বিলাল- এখন তোর আল্লাহকে ভুলে যা। মুহাম্মদ (স.) এর দ্বীন থেকে বেরিয়ে আয়। লাত-মানাতের

www.amarboi.org

উপর ঈমান আন, তাহলেই কেবল মুক্তি, না হয় মৃত্যু। এমনি মুহূর্তে হযরত বিলাল (রা.) শাহাদাত আঙ্গুল উঁচু করে বলতে লাগলেন

اَحَدٌ. اَحَدٌ. لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ.

তেমনিভাবে নির্যাতন সহ্য করেছিলেন হযরত খাব্বাব (রা.)। তাঁর প্রতি কাফের বেঈমানদের অত্যাচারের অবধি ছিল না। লৌহ জেরা পরিয়ে তাঁকে আরবের মরুভূমির প্রচণ্ড রোদে শায়িত করে রাখা হতো। রোধের তাপে তাঁর শরীর থেকে বিগলিত ধারায় ঘর্ম নির্গত হতো। অধিকাংশ সময়ই তাঁকে উত্তপ্ত বালুতে শয়ন করে রাখা হতো।

উত্তাপে তাঁর কোমরের গোশত পর্যন্ত গলে যেত। যার ফলে হযরত খাব্বারের কোমরে অনেক বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়।

একদিন খলিফা ওমর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত খাব্বাব রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুকে তাঁর প্রতি ইসলাম বিরোধীদের নির্যাতন সম্পর্কে জানতে চাইলে হযরত খাব্বাব রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন করলেন। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর কোমর দেখে বললেন আল্লাহর কসম! এমন কোমর তো আমি কখনো দেখিনি। হযরত খাব্বাব রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন– 'আমাকে আগুনের অঙ্গারে চেপে রাখা হতো। এরপর আমার রক্ত এবং চর্বি গলে আগুন নিভে যেতো।'

মূলত এই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোকদের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে সেই কল্যাণ ও মঙ্গলের সৌরভে সুবাসিত মানব সমাজ, যে সমাজ পৃথিবীর বুকে বিশ্ব মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন। আজো পৃথিবীর মানুষ যাবতীয় শোষণ, লুণ্ঠন, নির্যাতন-নিপীড়ন, অন্যায়-অত্যাচার, নির্যাতন, নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি লাভ করে একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী, শোষণযুক্ত ভীতিহীন ও নিরাপত্তাপূর্ণ সমাজ লাভ করতে সক্ষম হবে, যদি আলোচ্য বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের চারিত্রিক ভূষণে পরিণত করতে সক্ষম হই। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে আলোচ্য বৈশিষ্ট্যগুলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

www.amarboi.org

একনজরে আল কোরআনে মুমিনের বৈশিষ্ট্য

০১.	সূরা আল বাকারা	: ৩, ১৭৭
০২.	সূরা আল ইমরান	: ১৫-১৭
০৩.	সূরা আন নিসা	: ১২২
০৪.	সূরা আল মায়েদা	: ০৭
০৫.	সূরা আল আনফাল	: ১-৪, ৭৪-৭৫
০৬.	সূরা আত তাওবা	: ১৩-১৫, ১৮, ৪৯, ৭১, ৮৮, ৯৯, ১১১-১১২, ১১৯
০৭.	সূরা ইউনুস	: ১০৪
০৮.	সূরা হূদ	: ৪১, ১১২-১১৩
০৯.	সূরা আর রা'দ	: ২০-২২, ২৮-২৯
১০.	সূরা ইবরাহীম	: ১১-১২
১১.	সূরা আল কাহফ	: ২২-২৪
১২.	সূরা আল মুমিনূন	: ১-১১, ৫৭-৬১
১৩.	সূরা আন নূর	: ৩৬-৩৭, ৫১-৫২, ৬২
১৪.	সূরা আল ফুরকান	: ৬৩-৭৫
১৫.	সূরা আন নামল	: ১-৪
১৬.	সূরা আল আনকাবূত	: ২৪
১৭.	সূরা আস সাজদাহ	: ১৫-১৬
১৮.	সূরা আল আহযাব	: ২২-২৩, ৩৫
১৯.	সূরা আল ফাতির	: ২৮-২৯
২০.	সূরা ইয়াসিন	: ১১
২১.	সূরা আয যুমার	: ০৯
২২.	সূরা আল মুমিন	: ৫৫
২৩.	সূরা হা-মীম আস সাজদাহ	: ৩৩-৩৬
২৪.	সূরা আশ শূরা	: ১৭-১৮, ৩৬-৩৯
২৫.	সূরা আয যুখরুফ	: ৬৭-৬৯
২৬.	সূরা আল হুজুরাত	: ১০
২৭.	সূরা আত তাহরীম	: ০৫
২৮.	সূরা আল মা'আরিজ	: ২৩-৩৫
২৯.	সূরা আদ দাহর	: ০৫-১১
৩০.	সূরা আন নাযিয়াত	: ৪০-৪১
৩১.	সূরা আল আ'লা	: ১৪-১৫
৩২.	সূরা আল বায়্যিনাহ	: ৭-৮
৩৩.	সূরা আল আসর	: ০৩

www.amarboi.org

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com

ISBN : 978-984-8808-41-2